অমিতাভ চৌধুরী

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

Here malice, rapine, accident conspire,
And now a rabble rages, now a fire ;
Their ambush here relentless ruffians lay,
And here the fell attorney prowls for prey ;

—Samuel Johnson, London.

হায় রে সুখের দিন শোভা কব কায় ?
ইংরাজ টোলায় গেলে নয়ন জুড়ায় ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ও শেষ লেখাটি বাদে বাকি সব রচনাই 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার', শারদীয় 'দেশ' ও 'অমৃত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো লেখাকে পরিবর্তন করতে হয়েছে।

লেখক—

এক

আদি কলকাতা

প্রথম বসন্ত

এই সহর কলকাতায় ছটি রিপু যেমন প্রবল, ঋতুর বেলায় কিন্তু ঠিক তা নয়। শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত কখন আসে, কখন যায়—ঠিক টের পাওয়া যায় না। ভ্যাপসা গরমে গ্রীষ্মটা অবশ্য মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর যে ভাবে কলকাতা 'কল্লোলিনী' হয়ে ওঠে, তাতে বর্ষা ঋতুর দাপট যে প্রবলতর তা স্বীকার করতেই হয়।

তবু মজার ব্যাপার এই, কোনো ঋতুর রোমান্স্‌ই কলকাতা-বাসীদের মনে তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। 'স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জল' দিনের আবেশ 'এখন কারো চিত্তে অনুরাগ আনে না। আলুলায়িত-কেশ কোনো বিরহিণীকে দেখা যায় না যিনি নববর্ষার নতুন মেঘ দেখে বিহ্বল-চিত্ত। শুষ্ক গ্রীষ্মের দিনগুলিও ঠিক অনুরূপ ভাবে সত্য। চার্নক সাহেবের কলকাতায় বা আরো অনেক কাল পরে গুপ্ত কবির আমলে গ্রীষ্মের যে সংহার মূর্তি ছিল, আজ তার কী কণা মাত্রও আছে?

আসলে গাছ-গাছালির পরিধেয় ছেড়ে ইঁট-কাঠের পোশাক পরেছে বলেই সহর কলকাতায় এ অঘটন ঘটল। স্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতি নির্বাসিত হয়েছে বলেই সেই সরল আবেগ-ভরা হৃদয়টি হারিয়ে গেছে। পরিবর্তে পাওয়া গেছে ইঁট-কাঠের মত ছাঁচে ঢালা

নিরস চিত্ত। তাই কলকাতায় আজ ঠিক বসন্ত আসে না। নায়িকার মন নব-অনুরাগে তেমন ভাবে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে না। সাড়া জাগে না।

কিন্তু নায়িকার মন খুঁজতে গেলে কুসুম বিছানো বসন্তের দিন না হলে চলে না। এক কালে এই কলকাতাতে নায়িকাদের নিয়ে বিরহ-মিলন ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের যে হৃদয়াবেগের তরঙ্গ-ভঙ্গ চলেছিল, সেখানে ঢুকতে গেলে বসন্ত ঋতুর বড়ো দরকার। মধুমাসে মধু বাতাস না বইলে হৃদয়ের নিভৃত তন্ত্রাতে সব সুর ঝঙ্কৃত হয় না। অনুরাগের বেদনা তেমন নিবিড় হয়ে বেজে ওঠে না। তাই একালের বসন্ত দিয়েই সেকালের যৌবরাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।

মাঘ মাসের শেষে যখন বাতাসে একটু চোরা গরম দেখা যায়, তখনই আসেন একালের ঋতুরাজ। পাৎলা সোয়েটারটি পর্যন্ত তখন অসহ্য বোধ হয়। অফিসে অফিসে পাখা চলে। ময়দানের বিকেলটা বেশ দীর্ঘ ও মনোরম লাগে। সোনার আঁচল খসা তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে রূপকথার রোমান্স্ নিয়ে।

সদর স্ট্রীট-পার্ক স্ট্রীট কিংবা সারকাস্ এভিন্যুর ভেতর দিয়ে ঢুকে গেলে এখনো অলস মধ্যাহ্নের সুনিবিড় স্তব্ধতা অনুভব করা যায়। বুড়ো কেরামৎ আলীর সাদা দাড়িতে লাগে মেহেদীর রঙ। পলাশে শিমুলেও তার স্পর্শ। রহমৎ খাঁর রুটির দোকানের পাশে একান্ত সঙ্কোচে যে পলাশ গাছটি দাঁড়িয়ে আছে, তাতে লাগে আগুনের ছোঁয়া। আর বেচারি শিমুলেরও অণুমাত্র লুকোবার ঠাঁই নেই, বসন্ত তাকে অভিষেক করেছে রক্তিম ঐশ্বর্যে। নব মঞ্জরিত আমের কুঞ্জে শোনা যায় মধুকরের গুঞ্জন। কোকিলের ডাকে হঠাৎ জাতিস্মর হয়ে যেতে হয়, তিনশ বছর আগেকার বাঙ্লা দেশ মুহূর্তের ভেতর সব চেতনাকে আবিষ্ট করে দেয়। লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায় বা পার্ক স্ট্রীটের সিমেট্রিতে—যেখানে ছায়া সুনিবিড় স্তব্ধতা থম্ থম্ করে, ঘনপল্লবের ভেতর থেকে ডেকে ওঠে পিউ

কাঁহা, তখন পুরোনো কলকাতার সুন্দরী নায়িকাদের দীর্ঘশ্বাস আমাদের মনে অকারণে বিষণ্ণতার আবেশ আনে।

সেদিন কলকাতার বসন্ত-বাতাস সুরার মতন সুরভিত হত কী না, সেকালের নায়িকারাই তা বলতে পারতেন। তবে সেকালে তার অঙ্গে অঙ্গে—পলাশে-শিমুলে বকুলে-চাঁপায় যে বসন্তের ঢল নামত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইটকাঠের টোপর পরা এই নাগর কলকাতার সঙ্গে পুরোনো দিনের সেই গ্রাম্য কিশোরী কলকাতার ব্যবধান ছিল দুস্তর।

ঐ পুরোনো ও কিশোরী কলকাতার সঙ্গে একদা যাদের পরিচয় ছিল নিবিড়, তারা হল ইংরেজ। অনেক ডাঙ্গা-ডহর সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে এই ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। রেশম-পশম সুতো-মশলা তারা নিয়ে যেত জাহাজ ভরে। এদেশের হাটে হাটে ঘুরে সওদা করত নানান পণ্য। এদেশ থেকে কেবল তারা নিত। না, দেবার মতন তাদের বিশেষ কিছু ছিল না। একমাত্র ইউরোপীয় মন ছাড়া। একদা এই ইউরোপীয় মনের ছোঁয়া লাগল কলকাতায়। এখানকার পাঠশালা মক্তবে, আচার-অনুষ্ঠানে, পোশাকে-আশাকে, মন্দিরে-মসজিদে চিন্তা-ভাবনায় আদালতে-কাছারীতে মায় আমাদের হেঁসেলে পর্যন্ত ইউরোপীয় মন প্রভাব ফেলল। এই সহর কলকাতায় গড়ে উঠল নব্য সংস্কৃতি। এই নব্য সংস্কৃতিতে বিদেশী দানের ছাপ চিরকালের মতন রইল মুদ্রিত হয়ে।

সাহেবরা এদেশে এসে থেকেছেন দীর্ঘদিন। মুঙ্গের-মুর্শিদাবাদ-হুগলী-কাশেমবাজার নয়, কলকাতার কুঠি ঘিরেই একদিন তাদের আসর জমে উঠল। এখানকার সুখ দুঃখ ভালো-মন্দের সঙ্গে এই সাদা মানুষরা একদা গেলেন এক হয়ে। এ দেশের মাটিতেই কেউবা জন্মগ্রহণ করেছেন, কেউবা ইহ লীলা সংবরণ করেছেন এ মাটির কোলে। এখানকার কবরের তলাতেই শায়িত আছেন

অনেকে চির-নিদ্রায়। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-বসন্ত মিশে গেছে এঁদের প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে। কিংবা উদ্বেগ-আতঙ্কের ভেতর দিয়ে। নবাবী কোতলখানার উদ্যত খড়্গ এদের ঘাড় ছুঁয়ে গেছে অনেকবার। কলকাতার নির্মেঘ নীল আকাশে সেদিন শরতের সোনার আলো প্রবাসীদের মনে আহ্বান নিয়ে এসেছে ঘরে ফেরার। মন ব্যাকুল হলেও অনেকেই সেদিন কিন্তু ঘরে ফিরতে পারেন নি।

মসলিনের কামিজ, ঢিলে পায়জামা আর সাদা টুপি মাথায় দিয়ে আদি যুগের কলকাতায় ঘুরে বেড়াতেন ইংরেজনন্দনরা।

কলকাতায় যেদিন বসন্ত আসত, সেদিন সাদা ইংরেজদের পাশে কোনো শ্বেতাঙ্গনাকেই দেখা যেত না বসন্ত যাপনের জন্য। মন-কেমন-করা সন্ধ্যা ফিরে যেত ব্যর্থ হয়েই। কিংবা—

আজকের চোখে সে ছিল রীতিমত রূপকথার যুগ। সহরের কোলেই জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর বাঘ-হরিণ বুনো শূয়োর নিত্য বেড়াত ঘুরে। আর খাল-বিলে কুমীরত ছিলই।

সেকালের সাহেবরা সকালবেলায় অফিসের কাজকর্ম করতেন। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে দিব্যি নিতেন একপ্রস্থ গড়িয়ে। বিকেলের দিকে কেউ যেতেন চাঁদপাল ঘাটে বেড়াতে। আবার কেউবা বোটে করে বেরোতেন জল-বিহারে। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর হুঁকো বা আলবোলায় তামাক খাওয়া ছিল এঁদের একটি বাদশাহী আরাম। মৌজ করে ধূমপান করতে করতেই এঁরা বিকেলের বা পরের দিনের কর্মসূচী ঠিক করে নিতেন।

ছুটীর দিনে ছোট-বড়ো কোনো সাহেবই বসে থাকতেন না ঘরের ভেতর। নৌকো ভাসিয়ে এঁরা চলে যেতেন চুঁচুড়া-চন্দননগরের পথে। কেউ বা সুখসাগরের বাগান বাড়িতে। আবার জঙ্গলে শিকার করতে যেতেন কেউ কেউ। হাতীর পিঠে চড়ে এঁরা বাঘ মারতেন, মারতেন হরিণ। বন্য বরাহ শিকারে এঁদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। শিকার করতে করতে পনেরো মাইল দূরে নিউ

পার্ক পর্যন্ত যেতেন চলে। শিকারের সব নমুনা এই সব সাহেবরা সযত্নে নিজেদের ঘরে রাখতেন সাজিয়ে। ঘরে ঢুকলেই দেখা যেত বাঘ বা হরিণের চামড়া আছে মেঝেতে বিছানো। আর কোণে দাঁড় করানো থাকত একটা বন্দুক।

এই নায়কদের মনে বসন্তের ঢল নামত না যে, তা নয়। কিন্তু কে তা সামাল দেবে? শ্বেতাঙ্গনাদের অনুপস্থিতি তাই সেদিন বড়োই অনুভব করা যেত। এই সাদা কানাইদের মন ভরাতে তাই কালো রাধাদেরই আসতে হত এগিয়ে। মস্‌লিনের কামিজ ঢিলে পায়জামা আর সাদা টুপি মাথায় দিয়ে এঁরা নেটিবদের সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশে যেতেন।

বাইনাচ সম্পর্কে এঁদের কৌতূহল কম ছিল না। বাইনাচের আসরে নিমন্ত্রণ পেলে এঁরা সব কাজ ফেলে দিয়ে দৌড়ে যেতেন, সারা রাত কাটিয়ে আসতেন হৈ-হুল্লোড় করে। মাঝে মাঝে নিজেদের মজলিসেও দিতেন বাইনাচ। ফ্যান্সী ড্রেস বলেও খুব আমোদ জমে উঠত। কেউ সাজতেন পাহারাওয়ালা, নাগা-সন্ন্যাসী, কেউ মুনসী, আবার কেউ বা সুবাদার।

সাহেব আমলের প্রথমটা এ ভাবেই কাটছিল। সাগরের ওপার থেকে যেদিন হতে একটি দুটি করে মেমসাহেবদের আবির্ভাব শুরু হল, সেদিন থেকেই আরম্ভ হল ঋতু বদল, নতুন যুগ এলো। আঠারো শতকের শেষাশেষিতেই তার সূচনা।

আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত এখানকার এই সহর কলকাতায় পুরুষদের তুলনায় ইউরোপীয় মহিলাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। সমগ্র বাংলায় সামরিক কর্মচারী ধরে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক চার হাজারের বেশি ছিল না। সে জায়গায় সাদা মহিলারা ছিলেন মাত্র আড়াইশ।

পরে এই সংখ্যা উভয় পাল্লাতেই বাড়তে থাকল।

সেকালে একজন সাদা মহিলার পক্ষে এদেশে আসা ছিল অনেক ব্যায় সাধ্য ব্যাপার। অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা করে মাথা পিছু

খরচ পড়ত। এই কালা আদমিদের দেশে সৌখীন মেয়েরা আসতেই চাইতেন না। যদি বা আসতে রাজী হতেন, পথের ক্লেশ কী কম হত! তবে কোন রকমে এসে পৌঁছুতে পারলে, আর ভাবনা থাকত না। চাঁদপাল ঘাট থেকেই তিনি যৌবরাজ্যের সোনার সিংহাসন দখল করে ফেলতে পারতেন। রাতারাতি তিনি লাভ করতে পারতেন রাণীর মর্যাদা। বসন্তের মদির রাত উতরোল হয়ে উঠত তাঁর জীবনে।

সাংসারিক কাজকর্ম কিছুই দেখবার দরকার হত না। অসংখ্য দাসদাসী ঘিরে থাকত তাঁকে। মুখের কথা বলবার আগেই দাস দাসীরা এগিয়ে এসে পালন করত তাঁর আদেশ। বড় বড় তাল পাতার পাখা নিয়ে বাতাস করত বেহারারা। এই বেহারারদেরই আবার পোশাকের কত বাহার! গায়ে সাদা মসৃলিনের জামা, কোমরের ওপর সবুজ রং-এর কটিবন্ধ, মাথায় পাগড়ি।

অঢেল অবকাশ ছিল এঁদের জীবনে। অঢেল। কাজের জন্য কোনো তাড়া ছিল না। আটটা থেকে নটার ভেতর সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্‌তো এঁদের। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আরেক প্রস্থ ঘুম দিতেন। বিকেলের দিকে বেড়াতে বের হতেন।

সেই পাউডার পোমাটামের যুগে কেশ প্রসাধন কারীদের খুবই আদর ছিল। শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও সেকালে চুলের বাহারে ভালোই রপ্ত ছিলেন। এঁরা দিনে দুবার করে কেশ প্রসাধন করতেন। নেটিব হেয়ার ড্রেসার হলে মাসে দু টাকা করে মাইনে পেতেন। সে সময় দুজন ফরাসী কেশ প্রসাধনকারী এই সহর কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের জীবিকার সন্ধানে। এঁদের মধ্যে একজন মেয়েদের কেশ বিন্যাসের জন্য দুটি করে মোহর নিতেন প্রতি মাসে। আরেকজন যিনি ছিলেন, তিনি হলেন মসিয়ঁ সিভেট। মহিলাদের প্রতিবার চুল কাটার জন্য আট টাকা করে দক্ষিণা নিতেন, আর প্রতিবার কেশ প্রসাধনের জন্য চার টাকা। পুরুষদের জন্য অবশ্য এর অর্ধেক লাগত।

এই প্রসাধন চর্চার মধ্য দিয়েই আরম্ভ হয়ে গেল মন দেওয়া নেওয়ার পালা।

পলাশীর যুদ্ধের পর সাহেবরা এদেশে জ'াকিয়ে বসলেন। কিন্তু তখনো ঠিক বসন্ত আসে নি। তখন সবে দু একটি কোকিলের ডাক শোনা গেল মাত্র। বসন্ত এলো পরে, যেদিন হেষ্টিংস্ সাহেব গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে বসলেন।

চাঁদপাল ঘাটে তোপধ্বনি হল। লাটসভার সদস্যরা নামলেন একে একে।

লাটসভার সদস্যদের ভেতর দুজনত রীতিমত নায়ক। একজন হলেন রিচার্ড বারওয়েল, অপরজন হলেন ফিলিপ ফ্রানসিস্। আর ওয়ারেণ হেষ্টিংস? তিনি নায়ক নন, মহানায়ক।

ইতিহাসে নায়কদের যুগ আছে, কিন্তু দুঃখ এই, নায়িকাদের জন্য কোনো যুগ নেই। ইতিহাসের পাতায় ওয়ারেণ হেষ্টিংস-ক্লেভারিং ফ্রান্সিস্-মনসন্-বারওয়েলের বৃত্তান্ত নানাভাবে লেখা আছে, কিন্তু কলকাতার বসন্তোৎসবে এ'রা কে কতখানি গায়ে আবীর মেখেছিলেন, তার কথা কে মনে রেখেছে?

আজ ডালহৌসি পাড়ায় বসন্ত আসে। বাতাসে লাগে গরমের ছোঁয়া। লালদীঘির পাড়ে সেদিনও এমনি বসন্তের ছোঁয়া লাগত। কয়লা-ঘাটা ফেয়ারলি প্লেসের অফিসে টাইপ করতে করতে যে মেয়েটি আজ অন্যমনা হয়ে পড়ছেন, তিনি কি জানেন এখানেই একদা ছিল ইংরেজদের পুরনো কেল্লাটা! জি. পি. ওর ভেতর বসে যিনি চিঠিতে ছাপ মারছেন, আমাদের মত তিনিও ঠিক জানেন না, এখানে কাছেই কোথায় যেন ইংরেজদের গোলা-বারুদ মজুত থাকত!

এ পাড়াতেই ছিল ইংরেজদের থিয়েটার। থিয়েটারের প্রথম অভিনেত্রী এমা র‍্যাংহামকে আজ কি কেউ মনে রেখেছে? এমার মত সুন্দরী মহিলা সেকালে কজন ছিল! এমা শুধু সুন্দরী নন, তিনি মক্ষিরাণী। এই এমাকে বিয়ে করবার জন্য গোটা কলকাতাই

যেন পাগল। পাত্র হিসাবে সকলেই সুপাত্র। কিন্তু সুন্দরী এমার কিছুতেই যেন পাত্র পছন্দ হয় না।

এমার হাসিতে ফুলফোটে, কটাক্ষে আসে মধুমাস। এঁকে দেখলেই সহর কলকাতার সাদা যুবকদের চিত্ত আত্মহারা। সেই সুন্দরী এমা হঠাৎ বিয়ে করে ফেললেন। যাকে বিয়ে করলেন, সে বেচারি কিছুদিন আগেও জানত না যে সে এই দুর্লভ সৌভাগ্যের নায়ক হবে। রাখাল ছেলের রাজা হওয়ার মতই জন ব্রিসৃটো সুন্দরী এমার স্বামী হয়ে গেল।—সেদিন কলকাতার বসন্ত ব্রিসৃটোর কাছে ধরা দিয়েছিল স্বর্গীয় মাধুর্য নিয়ে। আর যারা বঞ্চিত?—তাদের কাছে এ বসন্ত হয়ে রইল রোদন-ভরা।

সহর কলকাতার ইতিহাসে এই কালটাকে বোধহয় মধুমাস বললেই ভালো হয়। এক আধটা কোকিল নয়, অনেক কোকিলের ডাকেই বসন্ত হয়ে উঠল মদির। নায়িকারা দেখা দিলেন একে একে।

মনে পড়তে পারে আমাদের বেগম জনসনের কথা।

মিসেস্ জনসন নয়, বেগম জনসন। জনসনের স্ত্রী 'বেগম' হলেন কেমন করে? প্রথমে এই জিজ্ঞাসাই স্বাভাবিক। এর উত্তর মহিলার নামেই আছে লুকিয়ে।

ভদ্রমহিলা রক্তের উত্তরাধিকারে পুরোপুরি ইউরোপীয় ছিলেন না। গায়ের রঙ ছিল কালো। তা গায়ের রঙ কালো হোক, তাই বলে কিন্তু মনের রঙে ময়লা জমে নি। মনের রঙ ছিল রঙিন। প্রেমে তাঁর চিত্ত সদাই ছিল ডগমগ। তবে সাদা ছাড়া তিনি প্রেম করতেন না।

ক্লাইভ-ওয়াট্সের কলকাতায় তিনিই ছিলেন প্রকৃত নায়িকা।

এ নায়িকার বাড়িতেই জমে উঠত সন্ধ্যার আসর। বিছানো হত ফরাস। আলবোলা গড়গড়া আসত। আতরের গন্ধে ঘর ম ম করত। ইংরেজরা তখনো রাজপুরুষ নন, শুধু বণিক মাত্র। বিদেশী

ম্লেচ্ছ, তা হোক, এদের ভালো লাগত বেগমের। এই বিদেশীদের মধ্যে তিনি এমন কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন, যার জন্য এদের বাদ দিয়ে বেগম কিছু ভাবতেই পারতেন না। তাঁর ওঠা-বসা চলা-ফেরায় উছলে উঠত ইংরেজ প্রীতি। বেগমের আবাসে সন্ধ্যার আসরে পুরনো কলকাতার সাহেব নেটিবদের নিয়ে জমে উঠত পরচর্চা। সঙ্গে সঙ্গে পরনিন্দাও। দূরের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ ডাকত, শোনা যেত শেয়ালের ডাক। বড়ো বড়ো ছায়া কাঁপত দেয়ালে।

যেদিন অন্য কোনো মুখরোচক প্রসঙ্গ থাকত না, সেদিন সাহেবরা তাদের অনুরাগিনী নায়িকার গায়ের রঙ নিয়ে রসিকতায় মুখর হতেন। ক্লাইভ-ওয়াট্‌সের কলকাতায় বিদেশী নাগরদের মুখে এ রসিকতা শুনে ঘন ঘন লজ্জায় আরক্তিম হতেন বেগম সাহেবা। তাঁর মনের ভেতর সমাগত হত ঋতুরাজ বসন্ত।

হ্যাঁ, বেগম ছিলেন বহু-বল্লভা। তাঁর শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত ছিল পর্তুগীজ রক্ত। তাই একটু বেপরোয়াও ছিলেন। প্রথম চার বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি দুবার বিধবা হন। তৃতীয় বিবাহ তিনি করেন ক্লাইবের সহযোগী ওয়াটস্‌ সাহেবকে। বিবাহের অল্পদিন পরেই ওয়াটস্‌ দেহ রক্ষা করেন। এরপরে বেগম সাহেবা একজন ধর্মযাজকের মনোহরণ করলেন এবং অচিরেই হলেন তার সহধর্মিনী। তবে রেভারেণ্ড উইলিয়ম জনসন বেশ সুবিধার লোক ছিলেন না। বরং একটু গোলমেলে লোক ছিলেন বলা চলে। ধর্মযাজকের রীতিতে তিনি ঠিক চলা ফেরা করতেন না। সত্তেরোশ অষ্টআশি সালে হঠাৎ বিনা নোটিশে বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বদেশে। বহু বল্লভা বেগম এবার ঠিক বিধবা হলেন না বটে, কিন্তু যন্ত্রণাটা মৃত্যুর বাড়া হয়ে দাঁড়াল।

এরপরে আরো চব্বিশটি বসন্ত বেঁচে থাকতে হয়েছিল এই রসবতী নারীকে। প্রায় সব বসন্তই রোদনভরা। ইংরেজদের গৌরবময় দিন চোখের ওপর তিনি দেখলেন। পাল্কী চড়া

কলকাতাকে তিনি দেখলেন ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনিতে মুখর হতে। ধর্মযাজক জনসনকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি, তাই তাঁর কাছে এ নাম কেউ উচ্চারণ করতে সাহস করত না। অবশিষ্ট জীবন বেগম বেঁচে ছিলেন বাকি তিনজন স্বামীর স্মৃতি চর্চা করে। তাদের গৌরবে গরবিনী হয়ে। লর্ড লিভারপুল যিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন, ইনি ছিলেন বেগমের নাতি। নাতির প্রধান মন্ত্রী হবার খবর পেয়ে দিদিমা খুশিতে আপ্লুত হন এবং সেই খুশিতেই চোখ বুজলেন। এ দেশের কালো চামড়ার জয়যাত্রা এবং পরিশেষে চরম জয় তিনি স্বচক্ষেই দেখে গেলেন।

কলকাতার বসন্ত লীলায় এক বহুবল্লভা নায়িকার কথা বলা হল, এবার আমরা জিজ্ঞাসা লরতে পারি ঐ মধুমাসে মধুকর নায়ক কী কেউ ছিলেন না?—অবশ্যই ছিলেন, ফ্রান্সিস হেষ্টিংস সকলের মধ্যেই ষড়রিপুর প্রথম রিপুটি ছিল প্রবল। ফুলে ফুলে মধুপান করতেই এ'রা ভালো বাসতেন। তবে সামাজিক মর্যাদা বা সেকালের প্রতিষ্ঠার কথা মনে রেখেই এ'রা একবারে বেপরোয়া হতে পারতেন না। কিন্তু বারওয়েল সাহেব এ সব খামোখা মানতে যাবেন কেন? কলির কেষ্ট নয়, তিনি প্রকৃতই ছিলেন 'কলিকাতার কেষ্ট'। তাই তাঁকে ঘিরে জমল আরেক নাটক।

লাটসভার সদস্যদের ভেতর ইনিই ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। হেষ্টিংসের থেকে ন বছরের এবং ফিলিপ ফ্রান্‌সিসের থেকে ছোট ছিলেন এক বছরের। জনসন আর ক্লেভারিং-এর কথা না তোলাই ভালো। জনসন এই বারওয়েলের থেকে এগারো বছরের এবং ক্লেভারিং উনিশ বছরের বড়ো ছিলেন। যাইহোক, সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্যদের ভেতর ইনি যখন সর্ব কনিষ্ঠ, এ'র ভেতর ষড়রিপুর শ্রেষ্ঠ রিপুটি যে প্রবল হবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

রিচার্ড বারওয়েলের বাবা উইলিয়ম বারওয়েল পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে ইসট্ ইণ্ডিয়া কোমপানির অধীনে বাংলার গভর্নর

ছিলেন। এই কলকাতাতেই হেমন্তের এক বিষণ্ণ দিনে রিচার্ডের জন্ম হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরের বছর কোমপানির অধীনে রাইটারের চাকরী নিয়ে কর্মজীবনের সূচনা। তখন সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, বয়স সতেরো। পনেরো বছর পরে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ইনি লাটসভার সদস্য হলেন। মোট কথা, স্বীকার করতেই হয়, বারওয়েলের মত করিৎকর্মা লোক সেকালে দুটি ছিল না।

ফিলিপ ফ্রানসিস্ এঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয় এখানকার আবহাওয়ার ও এদেশের যতগুলি খারাপ গুণ আছে সব গুলিই বারওয়েল সাহেবের ভেতরে বর্তমান। প্রকৃত অর্থে তিনি একজন সার্থক নেটিব।··· হি উড বি গভর্নর জেনারেল ইফ মানি কুড মেক হিম সো।'—অর্থাৎ টাকাতে যদি সম্ভব হয়, তার জোরে তিনি একদা লাটসাহেবও হবেন। ঘোঁট পাকাতে এবং ঘুষ দিতে তাঁর মত ওস্তাদ কেউ ছিলেন না।

বারওয়েল সাহেবের আরো অনেক গুণ! জুয়া খেলায় তাঁর জুড়িমেলা ছিল ভার। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে প্রায়ই বসতেন জুয়া খেলতে; মাঝে মাঝে হাজার হাজার পাউণ্ডে হেরে যেতেন। এই রমণীরঞ্জন নায়কটির আরেকটি আমোদ ছিল ব্যাংকোয়েট দেওয়ায়। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীদের এইসব ব্যাংকোয়েটে নিমন্ত্রণ করে অপার্থিব আনন্দ পেতেন। মেয়েদের মন-ভোলানোর অনেক কায়দা-কানুন তাঁর জানা ছিল। আট হাত দূর থেকে এক ফুঁয়ে তিনি বাতি নেবাতে পারতেন। আর সেকালে ভোজের আসরে 'পেল্টিং বলে যে খেলাটি ছিল তাতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। 'পেল্টিং' হল ভোজের সময় রুটি-মাংস বা মণ্ডা-মেঠাই ছোঁড়াছুঁড়ির খেলা। সাহেবদের সঙ্গে মেমসাহেবরাও সোৎসাহে এ খেলায় মেতে উঠতেন। অব্যর্থ লক্ষ্যে এসব ছুঁড়ে মহিলাদের তাক লাগিয়ে দিতেন বারওয়েল। বন্ধুপত্নীরা এই 'কলিকাতার কেষ্ট'কে দেখে প্রেমে আপ্লুত হয়ে

উঠত। আর মহিলাদের এই খুশি খুশি ভাব দেখেই ক্লাইভ সাহেব ঐ নবীন নাগর সম্পর্কে লিখেছিলেন, '...হি ইজ্ এ গুড সিডিউসার অব ফ্রেণ্ডস্ ওয়াইভস্।'

বন্ধুপত্নীদের সম্পর্কে বারওয়েল সাহেবের কী ভীষণ দুর্বলতা ছিল হেনরী টম্সনের স্ত্রী সারার কাহিনী বিবৃত করলেই বোধহয় তা ধরা পড়ে। এমন কুৎসিত নাটকীয় ঘটনা সহর কলকাতার ইতিহাসে কথনো ঘটেছে কী না সন্দেহ।

কোম্পানির নৌ-বহরের এক তরুণ অফিসার ছিলেন হেনরী। পুরো নাম, হেনরী এফ টমসন। সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে লোকে এদেশে আসত টাকা পয়সা রোজগারের জন্য। হেনরী এফ টমসনও তাই এসেছিলেন। ভারী চট্পটে আর ভারি মিষ্টি স্বভাবের ছিলেন এই তরুণ অফিসারটি। এদেশে এসেই পরিচয় হল বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে এবং পরে পরে আরো অনেকের সঙ্গে।

সেবার ছুটী পেয়ে সাহেব দেশে গেলেন। আর দেশে গিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলেন। মেয়েটির নাম সারা বোনার। সারার নীল চোখ, সোনালী চুল আর অপরূপ দেহশ্রী নেশা ধরাল হেনরীর মনে। সারা তার স্বপ্নের অ্যাপোলোকে খুঁজে পেল হেনরীর ভেতর। হেনরীর মুখে সুদূর ইণ্ডিজের গল্প শুনতে ভারি ভালো লাগত। ভাল লাগত কলকাতার কথা, বাংলা দেশের বর্ণনা—ফেয়ারী-ল্যাণ্ডের মতন মনে হত কলকাতাকে। সেখানে বসে দুজনেই একটি নিরিবিলি কটেজের স্বপ্ন দেখতে থাকল।

অবরুদ্ধ ঝর্ণা বা উদ্দাম মৌসুমী বাতাসকে যেমন কোথাও স্থির ভাবে ধরে রাখা যায় না, দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমও কখনো এক জায়গায় বসে থাকে না। মিলনের জন্য তারা ব্যাকুল হবেই। হেনরী আর সারা তাই বিবাহের জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু ক্রীশ্চানী বিয়ের ঝামেলা অনেক। ইচ্ছে করলেও খুব

তাড়াতাড়ি সাড়া যায় না। চার্চ ও ফাদারের অনুমতি ও উপস্থিতি দুইই দরকার।

হেনরীর ছুটী এ ব্যাপারে বাদ সেধে বসল। তার ছুটী এত কম ছিল যে বিয়ে করা যায় না। আর ওদিকে ছুটী বাড়াতে গেলে কোম্পানী দেবে চাকরী ছুটিয়ে। সুতরাং—

সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে। অর্থাৎ বিয়ে না করেই বিয়ে হয়েছে বলে রটিয়ে দিতে ক্ষতি কী! জরুরী চিঠি পাঠালেন তিনি কলকাতায়। বন্ধুবর্গকে জানালেন, 'শুনলে তোমরা নিশ্চয় আনন্দিত হবে, আমি একটি সুন্দরী ললনাকে বিয়ে করে ফেলেছি, আমি যে জাহাজে যাচ্ছি, পরের জাহাজে তিনি স-ভগ্নী কলকাতায় পৌঁছুবেন।'

এই অভিনব সংবাদে কলকাতার বন্ধু মহলে খুশির জোয়ার বইল।

আর হেনরী অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে এবং নানারকম ঝামেলা সামলে এই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হলেন।

এদিকে হেনরী এফ টমসনের জাহাজ যথা সময়ে এই সহর কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এসে থামল। জাহাজে আসতে আসতে হেনরীর কত উদ্বেগ, কত ভাবনা! প্রেমিকা সারার কথা প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়েছে। কখনো কখনো সারার চিন্তায় সে এত আবিষ্ট হয়ে পড়েছে যে, সে ভুলেই গেছে জাহাজে রয়েছে। পাইন গাছের তলায় তাদের মিলনের সুখস্মৃতি, মান-অভিমানের মুহূর্ত, বিদায়ের লগ্নে সারার অশ্রুসজল দৃষ্টি সর্বদাই জাগিয়ে রেখে দিয়েছিল হেনরী টমসনকে। আর সেই সঙ্গে সে এও ভাবছিল, কেমন করে সহর কলকাতার নতুন সংসারটি গড়ে তুলবে।

হেনরী-সারার এই প্রেম যখন পদ্মকোরকের মত একটি একটি করে পাপড়ি মেলছিল, সে সময় কলকাতার ইতিহাসে সাদা মেয়ের খুব অভাব ছিল। আর সে সাদা মেয়ে যদি প্রকৃত সুন্দরী হত,

তবে ত কথাই নেই! সাদা কলকাতা তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেত। সুতরাং নাগর কলকাতা যে নায়িকা সারার জন্য পাগল হবে সেত খুবই স্বাভাবিক।

হেনরী টমসন যখন জাহাজ থেকে চাঁদপাল ঘাটে নামতে যাচ্ছে, তখন তারও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা মেয়েদের হওয়া উচিত ছিল, তার বেলায় যেন সেটাই হতে চলেছে। তার কী খাতির! কী খাতির! এই অকারণ খাতির বৃদ্ধি কেন? এত সমাদর হেনরী জীবনে কখনো পায় নি। বারওয়েল সাহেব সকলের আগে এসে করমর্দন করলেন। তারপর বুকে টেনে নিলেন। টমসন সাহেব কিন্তু বেশিদিন কলকাতায় থাকতে পারল না। জাহাজের চাকরি, সুতরাং জাহাজ নিয়ে বেরতে হল। সারার আসা পর্যন্তও থাকার সুযোগটুকু পেল না বেচারি।

পরের জাহাজে সারা যখন এসে পৌঁছুল, বারওয়েল সাহেবের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে তুললেন। সেকালের কলকাতায় বিরাট বিরাট বাড়ির মালিক ছিলেন সাহেব। আজ যাকে আমরা রাইটার্স বিল্ডিংস্ বলি, এই বিরাট প্রাসাদের মালিক ছিলেন বারওয়েল সাহেব। আর আলিপুরে যে বাড়িটিতে তিনি থাকতেন, সে আরেক বাদশাহী সৌধ। লোক-লস্কর পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে বাদশাহী আড়ম্বরেই থাকতেন বারওয়েল সাহেব। আর পেয়ায়ের লোক হলে, তাদের নিয়ে গিয়ে নিজের কুঠিতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতেন।

সারাকে দেখে বারওয়েল সাহেবের প্রীতি উছলে উঠল। মিঃ কাটারকে যেখানে তিনি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তারই পাশে সারা-হেনরীর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সাহেবের বাড়ির অলিন্দের খোপে খোপে অনেক কপোত-কপোতী ছিল, কূজন-গুঞ্জনে তারা সুখেই কাল যাপন করছিল। এখন একটি মানব

দম্পতি এলো, বারওয়েল সাহেবের নির্জন-নিভৃত একটি কক্ষ তাদের কূজনে-গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল।

বারওয়েল সাহেব হেনরীকে সত্যিসত্যিই সুনজরে দেখেছিলেন। তাঁর সুনজরের জন্য হেনরীর পদোন্নতি ঘটল।--জাহাজের চাকরীর বদলে সে একটি ডাঙ্গার চাকরি পেল।

সারা আর হেনরীর সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সুদূর ইংলণ্ড থেকে এই নির্জন কলকাতায় এসে সারার খুব একটা ভালো লাগে নি। বন-জঙ্গল, মশা-মাছির উৎপাত, শেয়ালের ডাক ও কদাকার নেটিবদের দেখে সুন্দরী সারার মন মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হয়ে উঠত। কী ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হত। আর ঠিক সেই সময় বারওয়েল সাহেব দেখা দিতেন। এই সদানন্দ সাদা মানুষটিকে সারার কী ভালোই যেন লাগত! খুশিতে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত। হেনরীরও খুব ভালো লাগত। বারওয়েলের আগমন সে কারণে অবারিত ছিল।

এই ভাবেই দিন কাটছিল। পাল্কী চড়ে পাড়া কাঁপিয়ে বারওয়েল সাহেব কোমপানির অফিস করতে যান। কখনো ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ান। ঝি-চাকর, আর্দালী-বেহারার, দরোয়ান কোচোয়ান সবাই সাহেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তটস্থ। হুকা-বরদার আলবোলা গড়গড়া নিয়ে সর্বদাই বারওয়েল সাহেবের কাছে কাছে ঘুরছে। কোচের ওপর আধশোয়া হয়ে ইনি গড়গড়া টানেন, আর নানান রকমের ফন্দী আঁটেন।

সেবার বারওয়েল সাহেব হঠাৎ হেনরীর জন্য একটি বিরাট চাকরী জোগাড় করে দিলেন। বছরে সাত হাজার তঙ্কা মাইনে। চাকরীটা হল ডেপুটি পে-মাষ্টারের। সুপারিশ বা মুরুব্বি না থাকলে এ চাকরী কারো জোটে না। তবে চাকরীটির একটি অসুবিধাও ছিল; কলকাতার বাইরে যেতে হবে। কলকাতার বাইরে যাওয়া মানে নির্বাসন। সেখানে শ্বেতাঙ্গিনী বধূকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

তাই চাকরী পেলেও বেচারী হেনরী খুব দ্বিধায় পড়লেন। টাকা পয়সা রোজগারের জন্যই এদেশে আসা। ভালো সুযোগ লোকে পায় না, আর তিনি কী এ সুযোগ অবহেলায় হারাবেন! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন! আর এদিকে সারাকে তিনি রেখে যাবেনই বা কোথায়?

এ অসময়ে আবার বারওয়েল সাহেবই এগিয়ে এলেন। অভয় দিয়ে বললেন, 'সারার জন্য তুমি ভেবো না, ব্রাদার। দাস-দাসী চাকর বাকর নিয়ে কলকাতার বাড়ীতে থাকতে সারার কোনো অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া আমি তো আছি, দেখা শোনার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি'।

হেনরী যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বন্ধুর হাতে সারার দায়িত্ব সমর্পণ করে হেনরী এফ টমসন পাড়ি দিলেন মফস্বলে। ছায়ায় ঘেরা পল্লীপথ দিয়ে সাহেবের পাল্কী চলল। হেনরী সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেন নি যে একজন স্ত্রী-খাদকের হাতে তাঁর স্ত্রীর দাযিত্ব দিয়ে এসেছেন।

এদিকে বারওয়েল ঘন ঘন তদারকি করতে আরম্ভ করলেন। ঘন ঘন আসেন সারার কটেজে। সারা ব্যাকুল হয়। বারওয়েল তার থেকেও ব্যাকুল হন। সারা শিহরিত হয়। বারওয়েল রোমাঞ্চিত হন। অঢেল উপঢৌকনে সারার ঘর ভরে যায়।— বাংলাদেশের বর্ষায় কদম রোমাঞ্চিত হয়, শরতে পদ্ম পাপড়ি মেলে। আর বসন্তের কথা না তোলাই ভালো। কুসুমের মাসে বাতাসে পর্যন্ত মাদকতা দেখা দেয়, সুতরাং ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রোষিত ভর্তৃকা সারারও যে চিত্ত বিকল হবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? হলও তাই। কোনো এক ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখর মদির মুহূর্তে সারার দেহমনের কর্তৃত্ব পেয়ে গেলেন সাহেব। বেচারি হেনরী সে সবের কিছু খবরই পেল না।

নাটকে যখন ক্লাইমাক্স, ঠিক সেই সময় বারওয়েলও গেলেন বদলী হয়ে। বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের কাছে মোতিঝিলে। এই বদলী

ঠেকা দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন সাহেব। কিন্তু কিছুতেই রোখা গেল না। তখন আরেক ফন্দী খাটালেন। এত্তেলা পাঠালেন, হেনরী এফ টমসনকেও আমার কাছে বদলী করা হোক। বারওয়েল সাহেবের সকল অনুরোধই ব্যর্থ হল। অগত্যা তাঁকে মোতিঝিলে একা একাই থাকতে হল।

এদিকে অপ্রত্যাশিত ভাবেই হেনরীর বদলীর আদেশ হল কলকাতায়।

খুশিতে গদগদ হয়ে লাফাতে লাফাতে সাহেব এলেন তাঁর ভার্যার সঙ্গে মিলিত জীবন যাপন করতে। ইতিমধ্যে অবশ্য বেশ কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেছে। মফস্বল থেকে সাহেব মাঝে মাঝে এসেছেন ; আবার ফিরেও গেছেন। অনেকগুলি ঋতু বদল হয়েছে। সাহেবের রঙ একটু কালো হয়েছে। দুটি সন্তানের জনক হয়েছেন তিনি। অবশ্য তাতে সারার শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় নি। বরং তাকে আরো বেশি সুন্দরী দেখায়। আরো রমণীয় মনে হয়। হেনরী প্রেমিকা নির্বাচনের জন্য মনে মনে নিজেকে তারিফ করেন।

দীর্ঘদিন মফস্বল বাসের পর এবার কলকাতায় এসে হেনরীর কেমন যেন লাগতে লাগল। সারার মনের কোনো উত্তাপ তাঁর মনকে জাগাতে পারল না। যে সারাকে তিনি জানতেন, এ যেন সে সারা নয়। তার সোনালি চুলে কেমন যেন রুক্ষতা ! নীল চোখে যেন কিসের ছায়া ! ভীষণ উদাসীন। অনেক সময় মাঝ রাতে হেনরীর ঘুম ভেঙ্গে গেছে, দেখেছেন বিছানায় সারা নেই। হেনরীও উঠে পড়েছেন , পরে তিনি দেখেছেন জানালার ধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সারা। নীরব নিস্পন্দ। হেনরী যত্ন করে নিয়ে এসে আবার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হল হেনরীর, কিন্তু কিছুতেই রহস্যের কিনারা করতে পারলেন না।

পরে হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা একবারে জলবৎ তরলং হয়ে গেল।

সে এক মেঘ-মেঘ দিন। মাঝে মাঝে রোদ উঠছে। তারপর মেঘ এসে আবার ঢেকে দিচ্ছে রোদ। সকালবেলার কাজ সেরে এসে লাঞ্চের পর গড়গড়ায় একটু তামাকু সেবন করছিলেন হেনরী। পাশেই মিঃ কাটারের বাংলোয় একটি কুকুর অবিরাম ঘেউ ঘেউ করছিল। দুটো শালিখ কিচির-মিচির করছিল সামনের লনে। এমন সময় এক ডাক-পিয়ন এসে লম্বা সেলাম করে একটি চিঠি দিল। খামে-ভরা চিঠি।

খামের ওপর মি. কাটারের ঠিকানা লেখা।

মি. কাটারের চিঠি এখানে দিল কেন?—কৌতূহল হল হেনরীর। কাটার তাঁর প্রতিবেশী। বারওয়েল সাহেবের বাড়িতে তিনিও থাকেন। ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে কী ডাক-পিয়ন ভুল করল?

গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক করে টান দিতে দিতে সাহেব খামটা একবারে ছিঁড়ে ফেললেন। আর ছিঁড়ে ফেলতেই বারওয়েলের লেখা একটি চিঠি বেরিয়ে এলো।

আর সব থেকে মজার কথা মি. কাটারকে এ চিঠি তিনি লেখেন নি, লিখেছেন তাঁর স্ত্রী সারাকে। অর্থাৎ এটি হল সারার প্রতি বারওয়েলের প্রেমপত্র। এ পত্র পড়লে বোঝা যায় তাদের দেহমনের দেওয়া-নেওয়া কতদূর এগিয়েছে।

চিঠিটা রীতিমত গরম। ছত্রে ছত্রে দেহের প্রতি আসক্তি এক জায়গায় বারওয়েল সাহেব লিখেছেন, '…সারা, আমি কি বলছি, জানো? আমি বলছি, সারা, তুমি আমার প্রেম এবং তোমার দেহশ্রী দুয়ের ওপরই রীতিমত অবিচার করছ। দর্পণের সামনে একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে তোমার যে রূপ রয়েছে, তার উত্তাপ বার্ধক্যকেও উষ্ণতা এনে দিতে সক্ষম।'

শেষে বারওয়েল লিখেছেন, 'আই উইশ, ইউ অয়্যার উইথ মি অ্যাণ্ড ইওর হাজব্যাণ্ড অ্যাট্ এ ডিস্ট্যান্স!'

হেনরী গড়গড়া টানতে ভুলে গেলেন। হাতের নল খসে পড়ল মাটিতে। দুহাতে চোখ ঢাকলেন। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা দুলছে।

তা দুলুক, শক্ত হাতেই হেনরী সমস্যাটির সমাধান করতে চাইলেন। নজর রাখলেন ব্যাপারটি কোন্ দিকে যায়! এদিকে দেখা গেল প্রতিদিনই চিঠি আসছে। অনেক চিঠি। অনেক। আর প্রতিটি চিঠিরই এক ভাষা, এক সম্ভাষণ। একই উত্তাপ। হেনরীর অনুপস্থিতিতে বারওয়েল কী সর্বনাশ করে গেছেন সেটুকু বুঝতে সাহেবের আর বাকি রইল না। সাহেব তাই সোজাসুজিই একদিন সারাকে বললেন, আর দেরী নয়, সারা, চলো দেশে ফিরে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজী হয়ে গেল। দেশে ফেরবার জন্য হেনরী বাঁধা ছাঁদা আরম্ভ করে দিলেন। প্রায় সব যখন প্রস্তুত, হঠাৎ ধূমকেতুর মতন আবির্ভাব ঘটল বারওয়েল সাহেবের। মোতিঝিল থেকে সাহেব বদলী হয়ে এসেছেন কলকাতায়। আর কোনবার বদলী নয়, এরপর থেকে পাকাপাকি ভাবেই কলকাতায় থেকে যাবেন সাহেব।

এবং কলকাতাতেই যখন থাকবেন, তখন প্রেমিকা সারাকে ছাড়া বারওয়েল থাকবেন কী করে?—কী ভাবে যেন সারার সঙ্গে বারওয়েলের একটি গোপন শলা পরামর্শও হয়ে গেল! ফলে দেখা গেল, সারা হেনরীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তার যে নীল চোখ দিয়ে একদা প্রেম ঝড়ে পড়ত, এখন তা দিয়ে ক্ষরিত হতে থাকল আগুন।

সারা দেশে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হল। বরং হেনরী দেশে ফিরে যাক, এই হল তার দাবী। এর জন্য চাইলে হেনরী কিছু টাকাও পেতে পারেন। তা ছাড়া সারা হেনরীর বিয়েটা যখন ঠিক ভাবে হয় নি, তখন জোর-জবরদস্তি চলবে না।

জীবন সঙ্গিনীর মুখে এ জাতীয় কথা শুনলে জীবনের প্রতি নৈরাশ্য আসে। জীবনের প্রতি আকর্ষণ আসে শিথিল হয়ে। হেনরী টমসনেরও তাই এলো। তিনি যে চোরা বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, এ সত্য বুঝতে তাঁর দেরি হল না। আর চক্রান্তকারী বারওয়েলের ভদ্রতার মুখোশটাও এবার সরে গেল। বেরিয়ে এলো প্রকৃত স্বরূপ।

হেনরী রাজী হয়ে গেলেন বারওয়েলের কাছে সারাকে সমর্পণ করতে।

মহানুভব বারওয়েল অবশ্য ক্ষতিপূরণ দিতে এগিয়ে এলেন। আগেই বলা হয়েছে সাহেবের ছিল অগাধ পয়সা। জুয়ো খেলে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দেন। বন্ধুর বৌকে কেনবার জন্য কিছু খরচ তিনি করতেই পারেন।—হেনরীকে কিছু দেবার জন্য তি'ন তৈরী করলেন একটি বে-সরকারী দলিল। ডিভোর্সের জন্য তিনশ পাউণ্ড দিতে বারওয়েল প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলেন। আর দুটি সন্তানের খোর পোষ বাবদ ঠিক হল দেবেন পাঁচ হাজার পাউণ্ড। এই দলিলে সাক্ষী থাকলেন রবার্ট স্যাণ্ডারসন এবং হেস্টিংস সাহেব।

কোমপানির নৌবহরের পুরনো চাকরীতেই আবার ফিরে গেলেন হেনরী।

তরুণ অফিসার অনেক আশা নিয়েই কলকাতার মাটিতে পা দিয়েছিলেন। কলকাতা তার দেহমনকে নিংড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সাগরের জলে।

একটি জাহাজ চলেছিল পুবে চীন দেশের দিকে। সেই জাহাজে হেনরী গিয়ে উঠলেন। বিষণ্ণ ক্লান্ত নায়ক। নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে যায় সুন্দরী সারার নীল চোখের কথা। সেই নীল চোখ যে কখনো অমন বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে, ভাবতেই পারেন না হেনরী। তবু সে কথা ভাবতে হয়, এব

নীল জলের ওপর আঁকিবুকি কাটতে কাটতে ভেসে চলে জাহাজ। দিন চলে যায়।

বন্দরে জাহাজ পৌঁছুতে-না-পৌঁছুতে হেনরীর জন্য খবর এলো কলকাতা থেকে। এওেলা পাঠিয়েছেন বারওয়েল সাহেব। জরুরী তলব। লিখেছেন, চট্‌পট্‌ চলে এসো কলকাতায়। চট্‌পট্‌। নিজের প্রয়োজনেই তোমার আশা দরকার।

এর মানে? বেচারী হেনরী ভীষণ উদ্‌বিগ্ন হয়ে ফিরতি জাহাজে কলকাতায় চলে এলেন। ছুটলেন বারওয়েলের কুঠিতে। বারওয়েল সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'এসেছো ব্রাদার, ভালোই হয়েছে। একটু আগেই ইংলণ্ড যাবার একটি জাহাজে সারাকে তুলে দিয়ে এলাম।'

হেনরী ঠিক বুঝতে পারলেন না, তাই শেষ কটি শব্দ উচ্চারণ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুলে দিয়ে এলেন?'

'হ্যাঁ, ব্রাদার, তুমিও ফিরে যাও। সোজা হোমে'—

বারওয়েলকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না হেনরী। মনে হল, আরেক চক্রান্তের জাল বিছিয়েছেন বারওয়েল। আভাস পেলেন ষড়যন্ত্রের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই দলিলটার কথা। হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার সেই দলিলের টাকাটা পাবোত?

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!'

'কবে?'

বারওয়েল সাহেব গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিয়ে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে বললে, 'দেশে গিয়ে পৌঁছুলেই পাবে। লণ্ডনে আমার ভাই আছেন'—

হেনরী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বারওয়েল বললেন, 'আর এক মিনিট ব্রাদার। একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। এটি আমার ভাইকে দেখানো মাত্র টাকা পাওয়া যাবে।

আবার জাহাজ। আবার চাঁদপাল ঘাট। শেষবারের মত ইণ্ডিজ্‌কে ছেড়ে যাবার আগে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন হেনরী। মাথার ভেতর নানা চিন্তা পাক খাচ্ছিল। ঠিক কী হতে চলেছে বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ বারওয়েল সাহেবর পালকি ঘাটে এসে হাজির। মুহূর্তের ভেতর গুড়ি মেরে সাহেব বেরিয়ে এলেন পালকি থেকে। তারপর দৌড়ে হেনরীর কাছে এসে বললেন, 'ভালোই হয়েছে ব্রাদার। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি একবারে চিট্‌ বনে যেতাম। প্রতারণার দায়ে পড়তাম'—

গঙ্গার ধার। হু-হু করে বাতাস দিচ্ছে। তার ওপর কোলাহল। নেটিব কুলিরা মাল তুলছে জাহাজে। অনেক ইংরেজ ঘাটে এসেছেন স্বদেশ যাত্রীদের সি-অফ করতে। আর হেনরী নিজের চিন্তায় এতই বিব্রত, বারওয়েলের কথা ঠিক যেন শুনতে পেলেন না।

বারওয়েল বললেন, 'হেনরী, তোমাকে যে টাকা দেবার জন্য আমি এগ্রিমেনট্‌ করেছি, সে টাকাটা যাতে তুমি তাড়াতাড়ি পাও, তারজন্য আমি এসেছি। আমার ব্রাদারকে এখনই একটা ইন্‌স্‌ট্রাক্‌সন পাঠিয়ে দেব, তাতে তোমার একটা সই দরকার—

হেনরী বললেন, 'কোথায় সই করতে হবে?'

বারওয়েল একটি লম্বা কাগজ বের করে ফেললেন। তারপর সেই কাগজটির একটি অংশ দেখিয়ে বললেন, 'এই খানে—'

হেনরী খচ্‌ খচ্‌ করে সই করে দিলেন। বারওয়েল বললেন, 'যাক্‌ এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আই ইউশ ইউ গুড লাক। লণ্ডনে গিয়ে আমাদের কথা একটু মনে রেখো ব্রাদার। গুড বাই—'

যেমন ঝড়ের মতন এসেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই চলে গেলেন সাহেব। হেনরী মনে মনে একটু হাসলেন। সেই দিনটার কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন, যেদিন এই বারওয়েল সাহেবই রাজসিক সম্বর্ধনা দিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন চাঁদপাল ঘাট থেকে।—কী পরিবর্তন! মানুষ কত বদলায়!

হ্যাঁ সবাই বদলায়। বদলান না কেবল বারওয়েল সাহেব।

এই অপরিবর্তিত বারওয়েলকে আরেকবার হেনরী উপলব্ধি করলেন লণ্ডনে এসে। হেনরী টমসন লণ্ডনে পা দিয়েই জানতে পারলেন যে বারওয়েল তাঁকে চাঁদপাল ঘাটে এসে আরেকবার ঠকিয়ে গেছেন। আগের দলিলকে নাকচ করবার জন্য পাল্টা আরেকটা দলিলে তাঁকে সই করিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং পাঁচ-হাজার তিনশ পাউণ্ডের ইন্দ্রধনুও মিলিয়ে গেল আকাশে।—অসহায় হেনরী নিস্ফল আক্রোশে বার বার ঠোঁট কামড়ালেন।

আর বার বার মনে হল, বাংলাদেশে গিয়েই তাঁর এ অঘটন ঘটল। হল তাঁর সর্বনাশ।

বাংলাদেশ?—কামাসক্ত পুরুষদের কামনা চরিথার্থতা করবার উপযুক্ত জায়গা হল এই বাংলাদেশ! আর তিনি যদি নব্য নবাব হন, তবেত কথাই নেই! বসন্তের কলকাতা তাঁর কাছে শৌণ্ডিকালয়।

হেনরী এফ টমসন যদিও কোমপানির নৌ-বহরের অফিসার ছিলেন, এবং ডেপুটি পে-মাস্টার হিসাবে অনেকরই বেতন বিতরণ করেছিলেন, কিন্তু যে লোকটি কামনার-সলিলে নিমজ্জমান, সেই পাপীর বেতন কী তিনি দিতে পেরেছিলেন?—পারেন নি।

কিছুতেই-কিছু-করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তিনি কলম ধরলেন। লিখলেন একটি বই। বইটির নাম দিলেন, 'দি ইন্‌ট্রিগ্‌স্‌ অব এ নাবব' অথবা 'বেঙ্গল দি ফিটেষ্ট সয়েল ফর লাস্‌ট।' এর মানে হল, 'একজন নবাবের অবৈধ প্রণয়' বা 'কামাসক্তি, চরিতার্থ করবার উপযুক্ত ভূমি হল বাংলাদেশ।'

লেখক হিসাবে হেনরী কোন্‌ নামটি নিবার্চন করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই দুটি নামই বসিয়ে দিয়েছেন। আসলে দুটি কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। কলকাতার প্রথম বসন্ত

নারী-মাংস লোভী নব্য নবাবদের ব্যভিচারে কলুষিত। আর হেনরীর মতন ঠেকে শেখা লোকের সংখ্যা বোধহয় কম ছিল না।

আবার একথাও ঠিক, বাংলাদেশের আবহাওয়াটা ছিল এই লম্পটদের পক্ষে অনুকূল। ইংলণ্ডের সভ্য সমাজ থেকে যাঁরা একে একে এলেন, তাঁরা কেউই ধোয়া তুলসী পাতা নন। বিদেশ বিভুঁয়ে এসে সংযত জীবন যাপন করা দূরে থাক, এঁরা একবারে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। হয়ে উঠলেন উদ্দাম। লুঠপাঠ করলেন ধনরত্ন, টাকা-কড়ি এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীর সম্ভ্রমও। নেটিব মেয়েদের কথা বাদ, সারার মত কত খাঁটি ইউরোপীয় মেয়ে যে ঝড়ের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল, তার হিসাবে কে রাখে? সুতরাং হেনরী যা বলতে চেয়েছিলেন তা খুব একটা মিথ্যা নয়।

অবশ্য এ রাস-লালায় সাদা শ্রীরাধারা কেউ কম যেতেন না।

মিস্ স্যাণ্ডারসনের কথাই ধরা যাক। ইনি আরেক রূপবতী নায়িকা। রসবতীও। তরুণ কলকাতার একদা ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি।

সেই মিস্ স্যাণ্ডারসন হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। নাচের আসরে নায়িকা নির্দেশিত পোশাক-পরে যাঁরা নাচতে আসবেন, তাঁদের ভেতর থেকে বর বেছে নেবেন তিনি। নায়িকা-নির্দেশিত পোশাক অবশ্য একটু মজার। সবুজ রঙের ট্রাউজার ও শার্ট। মাঝে মাঝে পিংক সিল্কের পট্টি দেওয়া। আবার জায়গায় জায়গায় চুমকি বসানো। 'পি-গ্রীন্ ফ্রেঞ্চ ফ্রক ট্রিমড্ উইথ পিংক সিলক্' ইত্যাদি।

গভর্ণর হাউসে নাচের আয়োজন হল। নায়িকার আহ্বানে কজন নায়ক সাড়া দেন, তা দেখবার জন্য সকলে উদ্গ্রীব। এদিকে নায়িকাও পরেছেন নাচের সাজ। তাঁর নীল চোখে ঝলসে উঠে নীলকান্ত মণি।

নায়িকা-নির্দেশিত পোশাক পরে একে একে ষোল জন নায়ক দেখা দিলেন। রূপে-গুণে-কুলে-শীলে কেউ কম যান না। এর মধ্য থেকে পাত্র বাছাই কী সহজ কথা!

আরম্ভ হল নাচ। সকলের সঙ্গেই পর্যায় ক্রমে নাচলেন নায়িকা। আর কত রকমের নাচই না হল! যে যেমন নাচলেন সকলের সঙ্গে তেমনি ভাবে নেচে নায়িকা প্রত্যুত্তর দিলেন!

অনুষ্ঠানের শেষে মিস্ স্যাণ্ডারসন ধীর পায়ে উঠলেন গিয়ে পালকিতে। প্রণয়ী নায়কেরা পালকির তুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মার্চ করতে করতে কুঠি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন নায়িকার সম্মানে। একজন নায়ক অকপটে লিখে গেছেন, 'উই গ্রেভলি অ্যাটেণ্ডেড্ হার হোম, মার্চিং বাই দি সাইড অব হার প্যালানকিন্ রেগুলারলি মারশালড্ ইন্ প্রসেসান্ অব টু অ্যাণ্ড টু।'

কৌতূহল হতে পারে স্বয়ম্বরা হয়ে কার গলায় মালা দিলেন এই নায়িকা!—মেম সাহেব ভুল করেন নি। মিস এলিজাবেথ জেন স্যাণ্ডারসন্ উপযুক্ত ও যোগ্য নায়কের গলাতেই মালা দিলেন। —নায়কের নাম, বারওয়েল।

তবে সাহেবের যা চরিত্র সেই চরিত্রগুণে এলিজাবেথকে সুখী করতে পেরেছিলেন কিনা, এ সংশয় আমাদের মনে অনিবার্য ভাবেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু সংশয় নিরসনের সুযোগ মেমসাহেব দেন নি। বিয়ের পর মাত্র তু বছরের কিছু বেশি ঐ মহিলা বেঁচে ছিলেন। তুজনের যখন বিয়ে হয়, তখন সেপ্টেম্বর মাস। শরৎকাল। সতেরোশ ছিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দ। তুর্গাপুজোর জন্য তৈরী হচ্ছে নেটিব কলকাতা। কলকাতার মজা দীঘিতে পদ্মফুল ফুটেছে। শিউলি ছড়িয়ে পড়েছে গাছের তলা বিছিয়ে!—এরপর পুরো তুবছর ঘুরে গেল। এলো নভেম্বর মাস। শীত এসে গেল। তু বছর তু মাস পরে কলকাতার মাটিতে দেহ রাখলেন সুন্দরী এলিজাবেথ জেন। কলকাতার তুর্গোৎসব তখন হয়ে গেছে। দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের সমাধি ভূমিতে

শায়িত করা হল নায়িকাকে। হাসি-খুশিতে যে সর্বদা ডগমগ করত, যৌবন-শ্রীতে ঝলমল করত যে সদাই, যে ছিল কলকাতার নয়নমণি, দুটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সেই অপরূপা লাবণ্যবতী রমনী অকালে ঝড়ে পড়লেন।

সুন্দরী এলিজাবেথের জন্য বারওয়েল সাহেব কতটা কেঁদেছিলেন বা আদৌ কেঁদেছিলেন কী না, তা তাঁর জীবনীকারেরাই বলতে পারেন। তবে দক্ষিণ পার্কষ্ট্রীটে মেম সাহেবর সমাধিতে সাহেব বানিয়ে দিয়েছিলেন একটি বিরাট পিরামিড। বিরাট। বাদশা সাহাজান যেমন তাঁর বেগমের স্মৃতিতে নির্মাণ করেছিলেন তাজমহল, অনুরূপ উৎসাহে বারওয়েল মিশরীয় ভাস্কর্যে নির্মাণ করলেন পিরামিড।

পিরামিডের গায়ে কোনো সমাধি-লিপি লিখলেন না। অবশ্য তা না থাকলেও এটি যে বারওয়েল সাহেবের কীর্তি, তা সেকালে কারো অজানা ছিল না। আর বারওয়েল না-হলে এত খরচ করবে কে? —আজ যে বাড়িটিকে আমরা 'রাইটার্স বিল্ডিংস্' বলে জানি তার মালিকানা যে বারওয়েলের ছিল, এ খবর আমাদের জানা। সে সঙ্গে এটুকুও জেনে রাখা দরকার যে যখন সাহেব এটি ভাড়া দেন, তখন এ বাবদে বার্ষিক ভাড়াই পেতেন সাঁইত্রিশ হাজার সাতশ কুড়ি টাকা। নুনের ব্যবসায় বছরে আয় ছিল লাখ বা সওয়া লাখ। অপরাপর রোজগারের কথা না তোলাই ভালো।

যার এত টাকা, এত রোজগার, আর বয়স এত কম, তার পক্ষে বখামির পরিমানটা যে একটু বেশি বেশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? বখামির ঝোঁকেই বারওয়েল সাহেব একদিন হাত বাড়ালেন ক্লেভারিং সাহেবের মেয়ের দিকে। জেনারেল ক্লেভারিং যে-সে লোক ছিলেন না। রীতিমত লড়াইয়ে লোক। শত্রুতার জবাব দিতেন তিনি বন্দুকের নল দিয়ে। হোরেস ওয়ালপোল এই যোদ্ধার সম্পর্কে একদা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। যাই হোক,

জেনারেলের ছিল দুটি বিয়ে। প্রথম পক্ষে 'আর্ল অব দেল্ অয়ারের' কন্যাকে বিবাহ করেন। এঁর দরুণ তাঁর পাঁচটি সন্তান হয়। পরে বিয়ে করেন মিস্ ইয়র্ককে। প্রথম পক্ষের দরুণ তাঁর মেয়েরা বেশ বড়ো বড়োই ছিল। তবে ফিলিপ ফ্রানসিস্ থেকে বারওয়েল পর্যন্ত সকলেরই ঝোঁক ছিল প্রথমার দিকে। অর্থাৎ বড়ো মেয়েটির দিকে।

এলিজাবেথকে বিয়ে করবার আগে বারওয়েল সাহেব সোজাসুজি একবার এদিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। এ হাত যে কী হাত, জন ক্লেভারিং তা জানতেন। এর ওপর লাট সভায় বারওয়েল ছিলেন ওঁর বিরুদ্ধ পক্ষের লোক। সুতরাং যা অনিবার্য, তাই ঘটে গেল। জেনারেল ক্লেভারিং দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলেন বারওয়েলকে। অর্থাৎ দ্বৈরথ যুদ্ধে।

লড়াই হল দ্বৈরথ। প্রথম রাউণ্ডেই বারওয়েল আউট। ফিলিপ ফ্রানসিসের ভাষায় 'দে মেট অনদি সানডে ফলোয়িং। বারওয়েল রিসিভড্ ওয়ান ফায়ার অ্যাণ্ড আস্‌ক্‌ড পারডন।'—এক গুলিতেই বারওয়েল ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন।

আটত্রিশ বছর বয়সে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে বারওয়েল সাহেব এদেশ থেকে বিদায় নেন। প্রথম জীবনে তিনি যা জমিয়ে ছিলেন পরের জীবনে বসে বসে তার ফলভোগ করেন।—'অ্যাট দিস্ এজ হি স্যাট ডাউন ইন্ ইংলণ্ড টু এনজয় দি ফ্রুট্‌স্ হি হ্যাড গ্যাদার্ড ইনদি ইস্‌ট।' এখানে এসে আবার বিয়ে করলেন। সাসেক্‌সে একটি সুন্দর এষ্টেট কিনলেন। পার্লামেনটের সদস্য হলেন। একবারে নবাবী আড়ম্বরে জীবনের বাকী পঁচিশটি বছর কাটিয়ে দিলেন নির্বিঘ্নে। আঠারোশ চার সালে বাংলা দেশে যখন শরৎকাল, পদ্ম ফুটছে বাংলার খালে বিলে, এবং যে সেপ্টেম্বর মাসে এলিজাবেথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর কলকাতায়, সেই সময় সাসেক্‌সের ষ্টানষ্টেডে ঘনিয়ে এলো তাঁর শেষ মুহূর্ত। জীবন ও যৌবন নিয়ে বখামির

চূড়ান্ত করে সাবেক কলকাতার প্রথম বসন্তের এক নায়ক পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

তবু কলকাতায় বসন্ত। চির বসন্ত।

বসন্ত আর বসন্ত। মধু বাতাস বইছে। মধু বাতা ঋতায়তে।

আগুন লেগেছে শিমুলে পলাশে। নীল সমুদ্রের বুকে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে আসছে পালতোলা জাহাজ। কখনো আফ্রিকার উপকূল দিয়ে, আবার কখনো বা সংক্ষেপে ভূমধ্যসাগরের ভেতর দিয়ে জাহাজ চলে আসে সোজা লোহিত সাগর হয়ে আরব সমুদ্রে। মসজিদের ছায়া পড়ে সাগরের জলে, ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে যায়, সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় গা বমি বমি করে। পালতোলা জাহাজ তবু অবিরাম চলে ইণ্ডিজের পথে ; চলে বোমবাই। চলে কলকাতায়।

কলকাতায় যেতেই হবে। কারণ কলকাতায় তখন বসন্ত কাল। মধু বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আবেশ লেগেছে নায়ক-নায়িকার মনে। চলছে অবিরাম মন-দেওয়া-নেওয়ার পালা। এই মন-দেওয়া-নেওয়া থেকেই পরে জমে ওঠে দেহের রোমান্স !

মিস্ ক্রুটেনডেনের কথা ধরা যাক। ইনি আরেক সুন্দরী। আরেক বহু-বল্লভা

এই মক্ষিরাণীকে ঘিরে সেদিনের বসন্তে যে সব মধুকরেরা ভিড় করেছিল, কাউকেই তিনি নিরাশ করেননি। বিমুখ করেননি তিনি কোনো নায়ককে। পর পর চারজনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। পর পর ডিভোর্স করবার পর। একবারে শেষে বিয়ে করেন বব পটকে। বব পট মিস্ ক্রুটেনডেনের পঞ্চম স্বামী। আর বব পটও বারওয়েলের মত এক রোমান্টিক হিরো।

নায়ক হিসাবে ফিলিপ্স ফ্রানসিস্ও কম যেতেন না। মাদাম গ্রাণ্ডের ঘরে তাঁর নৈশ অভিযানের কাহিনী কলকাতার রোমান্সের

ইতিহাস তাঁকে অক্ষয় করে রাখবে। মাদামের অপূর্ব রূপলাবণ্যই যে ফ্রান্‌সিসের মনে বসন্ত এনে দিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিস্‌ ক্লেভারিং-এর প্রতিও সাহেবের অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। বারওয়েল-মিস্‌ ক্লেভারিং প্রসঙ্গ বলবার সময় ফ্রান্‌সিসের ভাষা যে ভাবে ধারালো হয়ে উঠেছে, তাতে তাঁর মনের ঝোঁকটা কোন দিকে বুঝতে বোধ করি অসুবিধা হয় না। বলা বাহুল্য, এর নাম 'জেলাসি।' প্রণয়ীর প্রতি ঈর্ষা।

দীর্ঘ একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা একদা ফ্রান্‌সিস্‌ মিস্‌ ক্লেভারিং-কে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। জাহাজটির নাম 'এ্যাশবার্‌নহাম।' এই জাহাজে ফ্রানসিসের সহযাত্রী ছিলেন মিস্‌ ক্লেভারিং। অষ্টাদশী তরুণী। সঙ্গে অবশ্য তরুণীর আরো দুটি বোন এবং বিমাতাও ছিলেন। চৌত্রিশ বছরের নায়কের চোখ কিন্তু ঐ অষ্টাদশীর ওপর। তার সৌন্দর্য অভিভূত করল ফ্রানসিস্‌কে। সোনালি চুলের ঢেউ, নীল চোখের নিবিড় চাহনি হৃদয় হরণ করল নায়কের।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই, সোজাসুজি মুখ ফুটে ফ্রানসিস্‌ একথা বলতে পারেননি মেয়ের বাপকে। মিশনরোর ওপর চার্চের দক্ষিণ দিকে একটি বাড়িতে ক্লেভারিং থাকতেন, সে বাড়িতে বহুবার গেছেন, চোখাচোখি হয়েছে বহুবার নায়িকার সঙ্গে, বসন্তের দমকা বাতাস এসেছে গঙ্গার ধার থেকে, কিন্তু কোনো কথা না বলতে পারার যন্ত্রণা নিয়েই কুঠিতে ফিরে এসেছেন নায়ক।

পনেরো দিনের পেটের অসুখে ভুগে তিরিশে আগষ্ট হঠাৎ ক্লেভারিং সাহেব দেহ রক্ষা করলেন। সেবার সতেরোশ সাতাত্তর সাল। বহু যুদ্ধের নায়ক পেটের অসুখের সঙ্গে পনেরো দিনও যুদ্ধ চালাতে পারলেন না। কয়েক ঘণ্টা ধরে সাহেব ভুল বকলেন। তারপর বেলা আড়াইটার সময় ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস।—লাট ভবন থেকে তাঁর সম্মানে তোপ পড়ল

অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে ক্লেভারিং-এর পাশে সারাক্ষণ ছিলেন ফ্রানসিস্। যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখনো। শোকে ভেঙ্গে-পরা মেয়েদের এবং সাহেবের বিধবাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'চলুন আমার কুঠিতে।'

ওরা গেল না। কান্নায় ভেঙ্গে-পড়া মেয়েদের বললেন। তারাও গেল না কেউ।

নায়িকার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রেমিক ফ্রানসিস্ পায়ে হেঁটে শবযাত্রার সঙ্গী হলেন। চললেন পার্কষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে। এই কর্তব্য পরায়ণতার কতখানি জেনারেলের প্রতি শ্রদ্ধায় আর কতখানিই বা মানিনী প্রণয়িনীর প্রতি অনুরাগে বিশ্লেষণ করে আজ তা বলা কঠিন।

যাই হোক, ফ্রানসিসের জীবনে জাহাজী প্রেম তেমন সফল হয় নি বটে, কিন্তু কারো কারো জীবনে হয়েছিল। যেমন ওয়ারেণ হেস্টিংস স্বয়ং তার নিদর্শন।

সতেরোশ উনসত্তর সালে বিপত্নীক ওয়ারেণ হেষ্টিংস একা একা ফিরছিলেন বিলেত থেকে। জাহাজটির নাম 'ডিউক অব গ্র্যাফটন'। সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় প্রণয়িনী নিকটে থাকলেও একঘেয়ে লাগে, সুতরাং যে পুরুষদের কাছে সঙ্গিনী নেই, তাদের কেমন লাগত—সে জিজ্ঞাসা না তোলাই ভালো। —সঙ্গী নেই, সঙ্গিনী নেই, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অবস্থাটি কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়! হেষ্টিংসের তাই বিশ্রী লাগছিল। নতুন করে নতুন চাকরি নিয়ে ইণ্ডিজে ফিরছেন— এ ব্যাপারে একটু উদ্বেগও ছিল।

এই জাহাজেই পরিচয় হল একটি ষোড়শী তন্বীর সঙ্গে। তার নাম সারা টমসন্। হেনরী এফ টমসনের নব-পরিণীতা বধূ। আগের জাহাজে স্বামী চলে গেছেন কলকাতা। পরে ইনি চলেছেন স্বামীর

কাছে। হায়! বেচারি সারা তখনো জানে না যে রাক্ষস বারওয়েলের কবলে শীগগিরই সে পড়তে চলেছে।

আর পরিচয় হল এক জার্মান দম্পতির সঙ্গে। দম্পতির নাম ইমহফ্। স্বামী ছবি আঁকেন। স্ত্রী মেরিয়ান লাজুক লাজুক চোখে তাকায়। মেরিয়ানকে দেখে ওয়ারেন হেষ্টিংসের দৃষ্টি আটকে গেল।

মেরিয়ানের নীল চোখের মোহে পড়ে গেলেন ওয়ারেণ হেষ্টিংস। ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন যে হেষ্টিংস সাহেবের এই ভারত-আগমন তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যসূচক হয়েছিল। কথাটা মিথ্যা নয়। মাত্র তিন বছরের ভেতর তিনি ভারত ভাগ্যবিধাতা হয়েছিলেন। শুধু রাজ্য নয়, পেয়েছিলেন সুন্দরী বধূও।

বেচারি টমসন এবং ইম্হফ সস্ত্রীক এসেছিলেন ভারতে ভাগ্য ফেরাবার জন্য। দুজনেই তাঁদের বৌকে খুইয়ে ঘরে ফিরলেন। হেষ্টিংসের প্রেমে পড়ে মেরিয়ান হলেন এদেশের প্রথম লেডি; আর ষোড়শী সারা বারওয়েলের পাল্লায় পড়ে একবারে ভেসে গেল।

কারো ভাগ্যে কলকাতার বসন্ত সরস হয়ে লঠল। কারো ভাগ্যে হল রোদন ভরা।

নইলে বেচারি সারায় অমন হবে কেন? আর মি. স্যাণ্ডারসন্ যিনি হেনরী টমসন ও বারওয়েলের ট্রাস্ট-ডীডে সই করেছিলেন এবং যিনি বারওয়েলের চরিত্র জানবার ভালোই সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি আবার এই বখা যুবককে জামাই করলেন কেন?—আসলে এ সবই কলকাতার মাটির গুণ। বসন্তের মায়া!

সত্যি, সবই যেন মায়া! কলকাতার মাটিতে সাদা মানুষদের নিয়ে কে যেন বিরাট থিয়েটার দেখাতে বসেছেন! একেকটি ছবি ভেসে উঠছে। জব চার্ণকের কলকাতা। হলওয়েলের কলকাতা। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। কালা নেটিবরা চলেছে দল বেঁধে কালীঘাটে পুজো দিতে। পরে আরেক দৃশ্য—ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এসে বসলেন তখ্তে। ধীরে ধীরে সব যেন পরিবর্তন হচ্ছে। কলকাতা হু হু করে বেড়ে চলেছে।

কলকাতার মঞ্চে দেখা দিলেন রূপসী নায়িকা এলথার লিচ্। তার অভিনয় দেখবার জন্য গোটা কলকাতা পাগল! আগুনের মত মেয়ে এলথার। বহু যুবকের চিত্তে সে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। সেই কারণেই বোধ হয় আগুন লাগল তার থিয়েটারে! এবং সেও পুড়ে মরল আগুনে।

রোজ এ্যালমার ফুলের মত পবিত্র আরেকটি মেয়ে। কবি ল্যাণ্ডরের প্রেমিকা। একদা বেচারি স্বদেশ থেকে নিরাশ্রয় হয়ে উঠল এসে কলকাতায়। তারপর এই কলকাতার মাটিতেই সব কটি পাপড়ি ঝড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে গেল।

আর মাদাম দেরমঁ্যাভিয়ে? —তার মত অভিশপ্তা মঞ্চনায়িকা কলকাতায় আর দু'টি এসেছে কি না সন্দেহ!

স্বীকার করতেই হয়, এঁরা সকলেই নায়িকা! কেউ মানিনা, কেউ রসবতী। কেউ একান্ত গোপনে নিজের দুঃখে নিজেই অশ্রুপাত করে গেছেন। কেউ সুখ পেয়েছেন অপরকে কাঁদিয়ে। অনেকেই ভরা যৌবনে ফুরিয়ে গেছেন, দক্ষিণ পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিতে শায়িত আছেন তাঁরা। কিংবা সার্কুলার রোডের কবরখানায়। কেউ মানিনী ফুরুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেছেন সাগর পারে। রেখে গেছেন নানান কিংবদন্তী। নানা রম্য কাহিনী। সেই সব কাহিনীর নায়করা অনেকেই কিন্তু এ দেশের মাটিতে দেহ রক্ষা করেছেন।

আজকের কলকাতার বসন্ত কী সেই সব 'হাসি-কান্না'র নায়ক নায়িকাদের স্মৃতি বহন করে আনতে পারে? তাদের দীর্ঘশ্বাস কী আমরা কান পাতলে শুনতে পাই?—ছায়া উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে কলকাতার আকাশ কালো করে যে নিবিড় বর্ষা নামে, সেই বর্ষা কী রোজ এ্যালমারের ঘরে না-ফিরতে পারার ব্যথাকে আজো পারে ফুটিয়ে তুলতে? —শীত ফুরিয়ে গেলে বাতাসে যখন চোরা গরম

দেখা দেয়, পার্ক ষ্ট্রীট-সার্কাস এভিন্যুর ভেতর দিয়ে ঢুকে গেলে ঘুঘু-ডাকা অলস মধ্যাহ্নে আমরা কী বাতাসে সেই পুরনো দিনের গন্ধ পাই ?

না, পাই না। এই সব নায়িকাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোথাও না। পুরনো বইয়ের হলুদ পাতার ভেতর এঁদের কাহিনী আছে লুকিয়ে। সময়ের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে। নতুন যুগের নতুন মানুষেরা পুরনোকে সহজেই ভুলতে বসে।

সুতরাং কে এদের মনে রাখে ?

অবশ্য একজন আছেন, যিনি সর্বদর্শিনী। যিনি নীরবে সব দেখেছেন এবং দেখছেন বা সব ঘটনার কারয়িত্রী। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। সেই অর্থে তিনি নায়িকাদেরও নায়িকা! তিনি কালীঘাটে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তবু সব কলকাতা তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত। মনে রাখতে হলে তিনিই রাখতে পারেন। তাই তিনিও স্মরণীয়। শরণীয়ও।

কিংবদন্তীর আলো-আঁধারিতে এই নায়িকার কথাও উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর। গল্পের মতই এঁর কাহিনী। কালো-সাদা সব মানুষই দেবীর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলেছে। সুতরাং নায়িকাদের আলোচনায় তাঁর নাম সর্বপ্রথম থাকা দরকার। সর্বপ্রথম। কলিকাতা নামটিও নাকি অনেকে মনে করেন 'কালিকা' নামের সঙ্গে সম্পর্কিত, সুতরাং নায়িকাদের নাম থেকে এঁকে বোধ হয় বাদ দেওয়া যায় না। কলকাতার নায়িকাদের আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গ-কথা অবশ্য আলোচ্য। এবং সর্বাগ্রে।

দুই

অথ কালীঘাট মন্দির কথা

বন-জঙ্গল আর খরস্রোতা গঙ্গার কোলে একদা গড়ে উঠেছিল কালীঘাট। অরণ্যে ছিল বাঘ, আর নদীতে ছিল কুমীর। অনেক কিংবদন্তীর আলো-আঁধারিতে পথ ছিল দুর্গম। তবু অনেকের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই এর ইতিহাস আছে জড়িয়ে। সাবর্ণ চৌধুরীদের পারিবারিক গৌরব ও ঐশ্বর্য মিশে আছে কালীঘাটের আকাশ-বাতাসে। আর গোটা সহর কলকাতার ইতিহাস যে মা কালীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সে কথা ম্লেচ্ছ ইংরেজদের পর্য্যন্ত অজানা নয়।

মন্দিরে অধিষ্ঠিতা দেবীকে নিয়ে যেমন অনেক নাটকীয় ঘটনা শোনা যায়, শোনা যায় অনেক কিংবদন্তী, মন্দিরের ইতিহাসও সে চমক থেকে আলাদা নয়। একালের যে মন্দিরটি আমরা দেখতে পাই, তার নির্মাণের ইতিকথা গল্পের মতনই রোমাঞ্চকর। কিশোরী কলকাতা খেলা-ঘর থেকে তখনো বেরোয় নি। তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-স্বার্থপরতা। আবর্তিত হচ্ছে খেয়ালী বাবুদের বিলাস আর হঠাৎ-ধনীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার দুর্বার মোহ। কিশোরী কলকাতার কাছে এ সব ছিল একেকটি খেলনা। ঐ খেলনা দিয়েই একদা সে বানিয়ে ফেলল একটি মন্দির। কালীঘাটের মন্দির। আর মন্দির মানে গল্পের মত একটি নিটোল ইতিহাস।

এ গল্পের নায়ক কে?—এ ইতিহাসের রাজা?—বলা কঠিন। কখনো মনে হতে পারে হাটখোলার দত্তবংশীয় চূড়ামণিবাবুই এর নায়ক। অথবা তাঁর ছেলে কালীপ্রসাদ। আর কালীপ্রসাদের কথা উঠলে অনিবার্যভাবে আসে শোভাবাজারের রাজবাড়ি। ওঠে

নবকৃষ্ণের কথাও। কিন্তু না, এঁদের সকলের কথাই ম্লান হয়ে যাবে যখন আমরা সাবর্ণ সন্তোষের কথা চিন্তা করব। সাবর্ণ পরিবারের সন্তোষ রায় কালীঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে কি কখনো আমরা মন্দির-নির্মাণের কথা আলোচনা করতে পারি?—তাই ইতিহাসের রাজা কে তা বলা কঠিন।—কিন্তু কারয়িত্রী যে দেবী কালিকা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবু এ কাহিনী আরম্ভ করতে হলে সন্তোষ রায়কে দিয়েই আরম্ভ করা ভালো। কেননা কালীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব কাছের। আর তাঁর জীবন নানারকম রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরা। পলাশীর যুদ্ধের বছর ষোল আগে যখন বাংলা দেশে বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দেয় তখন তিনি যুবক। বড়িশা-বেহালার তিনি আশ্রয়স্থল। —মারাঠা দস্যুরা সেদিন রাঢ়-বাংলায় সৃষ্টি করেছে রীতিমত আতঙ্ক। গ্রামের পর গ্রামে লাগিয়ে দিচ্ছে আগুন। লুঠ করছে অবাধে। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবীর তক্তে বসে ছিলেন যিনি সেই আলীবর্দী হিমসিম খাচ্ছেন এদের সঙ্গে লড়াইয়ে। এবং অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত এদের এঁটে উঠতে পারলেন না। তাই মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে সন্ধি হল। 'চৌথ' দেবার স্বীকৃতিতে বাংলা দেশে শান্তি কিনলেন আলীবর্দী। নবাব আলীবর্দী। আর 'চৌথ' মানেই একরাশ টাকা। মুর্শিদাবাদের ধনাগারে এমনিতেই ছিল প্রচুর অপব্যয়। এখন বড়ো ব্যয়টি ঢুকল। ফলে, রাজকোষ হয়ে উঠল নিঃশেষিত হবার মতন।

আলীবর্দী তাই বকেয়া খাজনা আদায়ে মন দিলেন। জমিদার আর রাজারাজড়াদের ওপর চাপালেন করের ভার। এ বোঝা বহন করতে যাঁরা অস্বীকার করলেন তাঁরা নবাবের কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। এমন কি কেউ কেউ বন্দীও হলেন। ঐ বন্দী হওয়া ব্যক্তিদের ভেতর পড়লেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং এবং আমাদের কালীর সেবক সন্তোষ রায়। সাবর্ণ সন্তোষ।

অবশ্য কিছুদিন পরেই এঁরা ছাড়াও পেলেন। তবে তা কৌশলে। না, সন্তোষ রায়ের ব্যাপারটি কৌশল না বলে আপন মহিমায় বলা যেতে পারে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপন জমিদারী দেখাবার জন্য নবাব আলীবর্দীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণের গঙ্গায়। বজরা করে ভেসে যেতে যেতে জঙ্গলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়েছিলেন নিজের জমিদারী। এ জমিদারী মানে গভীর বন। সে বনে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছিল বাঘের ডাক। কৃষ্ণচন্দ্র সে ডাক শুনিয়ে নবাবকে বলেছিলেন, 'হুজুর, ওরা আমার প্রজা। ঐ প্রজাদের কাছ থেকে কেমন করে খাজনা আদায় করি বলুন ত !' নবাব আলিবর্দী গোঁফে তা দিতে দিতে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যাপারটি বুঝেছিলেন। এবং মুর্শিদাবাদে ফেরার পর রেহাই দিয়েছিলেন রাজাকে।

আর সন্তোষ রায়? তাঁর কি হল?—নবাব তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন মুর্শিদাবাদের একটি বাড়ীতে। মানী ব্যক্তিকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েই রেখেছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন আদেশ পালনের জন্য ভৃত্য এবং রান্নার জন্য পাচক। আর নবাবের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রয়োজনমত আসত খাবার সামগ্রী। পাচক সেগুলিকে দিত রান্না করে। সন্তোষ রায় তোফাসে খেতেন।

সন্তোষ রায়ের চেহারা ছিল বিশাল। এবং খোরাকও ছিল বিপুল। নবাবের বরাদ্দ খাবারে ঠিক মত তাঁর কুলোত না। সর্বদাই তিনি ক্ষুধার্ত বোধ করতেন। একদিন সকালে হঠাৎ দেখলেন নবাবের ছাগ-রক্ষক অনেকগুলি ছাগল নিয়ে চলেছে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে। সন্তোষ রায় তাঁর একজন চাকর পাঠিয়ে জোর করে ওখান থেকে ছিনিয়ে আনলেন একটি পাঁঠা। তারপর সেটিকে কেটে ব্যবস্থা হল রান্নার। অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে রান্না করা পাঁঠা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ফেললেন সন্তোষ রায়।

এদিকে নবাবের ছাগ-রক্ষক যথাসময়ে এ খবর পৌঁছে দিল নবাবের কানে। নবাব প্রথমে এ কথা বিশ্বাসই করতে পারলেন

না। পরে কৌতূহলী হয়ে নিজে এলেন অনুসন্ধান করতে। সন্তোষ রায়কে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, রায় মশাই! আপনি আমার ছাগ-রক্ষকের কাছ থেকে পাঁঠা চুরি করে কী করেছেন?'

'খেয়েছি হুজুর।'

'খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হুজুর। আপনার পাঠানো খাবারে পেট ভরে না, তাই এ কাজ করেছি। গোটা পাঁঠাটিই আজ ভারি তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম।'

'বটে।' কিসের ইশারা খেলে গেল যেন আলীবর্দীর চোখে-মুখে। দাড়িটি চুমড়ে নিলেন। তা দিলেন গোঁফে। তারপর কটমট করে সন্তোষ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক বলছেন তো?'

'হ্যাঁ, হুজুর, ঠিকই বলছি। অবিশ্বাস হলে হুজুর আমাকে আরেকবার খাইয়ে দেখতে পারেন।'

সন্তোষ রায়ের কথাটি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন নবাব বাহাদুর। পরদিনই নবাব খাওয়াবার উদ্যোগ করলেন এবং নিজে বসে বসে দেখলেন খাওয়া। সন্তোষ রায় এদিনও অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। না-একটু ভাত, না একটুকরো মাংস—কিছুই পড়ে রইল না তাঁর পাতে। যা ছিল সব চেটে-পুটে খেয়ে নিলেন।

এই খাওয়া দেখে নবাব আনন্দে গদগদ হয়ে পড়লেন। সন্তোষ রায়কে বললেন, ভারি খুশি হলাম রায়মশাই, আপনার এ খাওয়া দেখে। তা এতখানি যাঁর আহার, তিনি যে আমার রাজস্ব বকেয়া রাখবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তাই আপনার বাকি খাজনা মুকুব করে আপনাকে এখনই আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর আপনার যাতে কখনো আহারে টানাটানি না পড়ে, তার জন্য আলাদা একটি মহল লিখে দিচ্ছি। এ হবে আপনার খোরাকী মহল।'

নবাব বাহাদুর আর দেরী করলেন না। ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি আবজাখালী নামে একটি মহল ছিল সেকালে। সেই মহলটি ব্রহ্মোত্তর হিসাবে তাঁকে দান করে দিলেন। লোকের মুখে মুখে এর নাম হয়ে গেল, 'খোরাকী মহল।'

এই হল সন্তোষ রায়। ইনি যে কেবল নিজে খেতে ভালো বাসতেন তা নয়। এঁর আনন্দ ছিল সকলকে খাওয়াতে। এঁর দান-ধ্যান ছিল অনেক। শোনা যায়, লক্ষ বিঘে জমি ইনি দান করেছিলেন চার মেলের ব্রাহ্মণদের। এবং যথার্থ কুলীনদের। এই সব ব্রাহ্মণদের নিয়ে অত্যন্ত সরলভাবে তিনি যাপন করতেন জীবন। জাঁকজমক বা অকারণ আড়ম্বর-সমারোহ কখনও তিনি পছন্দ করতেন না।

শোনা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার কালীঘাটে এসেছিলেন রাজকীয় সমারোহে। আর সেই সমারোহ নিয়েই দেখা করতে এলেন সন্তোষ রায়ের সঙ্গে। মহারাজা ধীরে ধীরে এগোন, তাঁর আগে পিছে চলে আশা-শোটা, নকীব, বরকন্দাজ, হাতি-ঘোড়া পালকি ইত্যাদি। সন্তোষ রায় সামান্য বেশে ও সাধারণভাবে দেখা দিলেন রাজার কাছে। সঙ্গে ছিল গুটিকয়েক আত্মীয় এবং দুয়েকটি চাকর। এ সরলতা দেখে রাজার তরফের কে একজন যেন বলে বসলেন, কী ব্যাপার সন্তোষ রায়ের এ অবস্থা কেন? লক্ষ লক্ষ বিঘে জমি যিনি দান করেন ব্রাহ্মণদের, মস্ত যাঁর জমিদারী তাঁর এমন দশা? কোথায় গেল তাঁর আশা-শোটা, বরকন্দাজ আর হাতী-ঘোড়া-পালকি?

প্রশ্নটি শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন সন্তোষ রায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে পাঠালেন চারমেলের ব্রাহ্মণদের। এনে হাজির করলেন কুলীন-সন্তানদের। দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজ! এরাই

আমার আশাশোটা আর বরকন্দাজ। এরাই আমার হাতী-ঘোড়া উট-পালকি।'

এরকম অভাবিত উত্তর যে পাওয়া যাবে মহারাজ তা আদৌ আশা করেন নি। তাই লজ্জায় হেট করলেন মাথা।

যাই হোক, এই হল সন্তোষ রায়। অনেক কিংবদন্তীর তিনি নায়ক। অনেক গল্প তাঁকে ঘিরে। এবং বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সত্যিসত্যিই নানা নায়কোচিত গুণের সমাবেশ ছিল তাঁর চরিত্রে। ব্রাহ্মণদের প্রতি তিনি ছিলেন ভক্তিমান। দীনের আশ্রয়দাতা। আশ্রিতকে রক্ষা করতেন তিনি সদা-সর্বদা। দরকার হলে সকল শক্তি দিয়ে। আর কালীঘাটে কালীর ছিলেন তিনি একান্ত সেবক।

তাঁর আয়ুষ্কালও ছিল সুদীর্ঘ। আলীবর্দীর আমলে তাঁর যৌবন, আর তাঁর বার্ধক্য নেমে আসে কর্ণওয়ালিস-জনশোরের কলকাতায়। অনেক সামাজিক পরিবর্তনের তিনি ছিলেন সাক্ষী। দেখেছিলেন তিনি অনেক ওঠা-নামা। দিনে দিনে তাঁরই সামনে বিকশিত হতে দেখেছেন কালীঘাটের মহিমা।—তবে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরটি তখন ভালো ছিল না। একটু একটু করে আসছিল জীর্ণ হয়ে। সেবক সন্তোষ রায়ের ইচ্ছা ছিল তিনি মায়ের জন্য একটি সুন্দর মন্দির করে দেবেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তিনি তা পেরে ওঠেন নি। শেষ জীবনে এটুকুই ছিল তাঁর দুঃখের। অথচ সহর কলকাতায় আকাশে-বাতাসে সেদিন উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা। অজস্র টাকা। বাবুদের বিলাসে ও রাজাদের খেয়ালে কত টাকাই না ব্যয়িত হয়।

সে সব টাকার সামান্য একটু অংশ পাওয়া গেলেই মায়ের যে মন্দির তৈরী হয়ে যেতে পারত তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বৃদ্ধ সন্তোষ রায় দান করেই ফতুর। তবু মায়ের মন্দিরের জন্য কখনো কখনো এরকম চিন্তা করতেন, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

এদিকে সহর কলকাতায় সেদিন যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল, তার একটু সামান্য ইতিহাস নেওয়া যাক। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে জন কোমপানী দিনে দিনে যেন ফুলে উঠতে থাকল। তার এ সমৃদ্ধির দিনে প্রায়ই সে আসত মায়ের কাছে ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা কোলে করে। বলিদান দেওয়া হত, আর পূজো দেওয়া হত জাঁকজমক করে। মন্দিরের অধিষ্ঠিতা দেবী নিতেন এ পূজো এবং তাঁর কৃপাতেই কোমপানি একদিন বসল রাজা হয়ে।

এ নতুন রাজার অনুগ্রহে অনেক সাধারণ লোকের ভাগ্যও বদলে গেল।

বনেদী বড়োলোকদের বাড়ির পাশে হঠাৎ বিকশিত হয়ে উঠল হঠাৎ বাবুদের ঝলমলে ঐশ্বর্য। দেখা দিল নিত্য-নতুন বাড়ি। বাবুদের নতুন নতুন খেয়াল। এবং বিলাসিতা।

শোভাবাজারের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের কথাই ধরা যাক। পলাশীর যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন সামান্য একজন ব্যক্তি। যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকেই তাঁর বরাত খুলতে আরম্ভ করল। এঁর পূর্বপুরুষ মুঘল সরকারের অধীনে কাজ করে উপাধি পেয়েছিলেন, 'ব্যবহর্তা'। আনুমানিক সতেরোশ বত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয়েছিল নবকৃষ্ণের। ছেলেবেলাতেই তিনি শিখেছিলেন আরবী-ফরাসী-উর্দু। পরে ইংরেজি। রাজা সুখময় রায়ের মাতামহ ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধরের কাছে প্রথম যৌবনে ইনি কাজ করতেন। ধর মশায় ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ধনী ব্যক্তি। জব চার্নকের সঙ্গে হুগলী থেকে সুতানুটিতে এসে বসবাস করেন—এ ধরনের জনশ্রুতি আছে। পলাশীর যুদ্ধের আগে ক্লাইব সাহেব এঁর পোস্তার বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। আসতেন নানারকম কাজে, এমন কি কোমপানির হয়ে টাকা ধার নিতেও। শোনা যায় ধর মশায় সেকালের কোমপানিকে মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ন লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন। আর নবকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাইবের সঙ্গে। এবং এই

ক্লাইবের মাধ্যমে নবকৃষ্ণ চেনেন ড্রেক-হলওয়েল-ওয়ারেণ হেস্টিংস্-কে।

এর ফলে জন কোমপানি ও নবকৃষ্ণ উভয়েই হলেন লাভবান। নিদারুণ দুর্দিনে অনেক বিপদের হাত থেকে কোমপানিকে বাঁচিয়ে-ছিলেন এই নবকৃষ্ণ। মুন্সী হিসেবে ষাট টাকা মাইনে পেতেন ইনি প্রথমে। সে সময় অনেক গোপন চিঠি তিনি মুশাবিদা করেছিলেন। সতেরোশ ছাপ্পান্নতে সিরাজউদ্দৌলার হাতে মার খেয়ে ইংরেজরা যখন একান্ত অসহায় অবস্থায় আশ্রয় নিল ফলতায়, তখন এই নবকৃষ্ণই জীবন তুচ্ছ করে একটানা ছয় মাস ধরে রসদ যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের। আর তাঁরই পাঠানো গোপন খবরে নির্ভর করে কলকাতা উদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন ক্লাইব।

সুতরাং দুর্দিনের এ বন্ধুকে ইংরেজরা কি ভুলতে পারে?—পারে নি।—তাদের ভাগ্য পরিবর্তিত হল। নবকৃষ্ণের ভাগ্যও। নবাবের ধনাগার লুণ্ঠনে ক্লাইব সাহেবর সঙ্গে তিনিও চললেন সঙ্গী হয়ে। জনশ্রুতি আছে, মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে লুঠ করা কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সোনা-রূপো মণি-মাণিক্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনিও। আরো নানারকম উপায়ে তিনি যে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন, সে সব কথা না তোলাই ভালো।

এইভাবেই দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের ভেতর 'ব্যবহর্তা' বংশের ছেলে রাজা হলেন। ক্লাইব সাহেব সত্যি-সত্যিই সম্রাট সাহ আলমের কাছ থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি আনিয়ে দিলেন। শুধু কাগজে কলমের রাজা নয়, পেলেন দশ হাজারী মনসবদারের অধিকার। ঘোড়াশালায় ঘোড়া হল, হাতীশালায় হাতী। তৈরী হল নতুন রাজার নতুন প্রাসাদ। এর নাম, শোভাবাজার। লোক লস্কর, পাইক-বরকন্দাজে এ বাড়ি সর্বদাই থাকল গম্‌গম্‌ করতে।

সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। বলল, হ্যাঁ, সত্যিসত্যিই রাজা বটে। বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এলেন। জগন্নাথ তর্ক

পঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের মত ডাকসাইটে পণ্ডিতেরা অলঙ্কৃত করলেন তাঁর সভা।

সবই হল। তবু তৃপ্তি নেই কেন?—কলকাতার বনেদী ধনী সমাজ এই হঠাৎ-রাজাকে স্বীকৃতি দিল না। রাজায় রাজায় রেষারেষি যেমন চলে, আরম্ভ হল সে রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একদিকে বনেদিআনা, অন্যদিকে হঠাৎ বাবুদের খেয়ালিপনা। একদিকে অবজ্ঞা, আর অপর দিকে প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার দাবী, এই নিয়ে বেড়ে চলল উত্তেজনা। জমল নাটক।

সেকালে পোস্তার লক্ষ্মীকান্ত ধরের মতই ধনী ছিল হাটখোলার দত্তরা। যেমনি ছিল এঁদের অঢেল অর্থ তেমনি ছিল অপরিমিত অপব্যয়। দত্তদের সারা বাড়িটি মোছা হত আতর দিয়ে! খাওয়া-দাওয়ার জন্য এঁদের বাড়িতে ব্যবহৃত হত সোনা-রূপোর থালা বাটি। এবং সে থালাবাটি পেতল কাঁসার মত যেখানে সেখানে পড়ে থাকত। বাবুরাও ছিলেন ভীষণ আয়েসী। পাড়ের কর্কশতায় তাঁদের বাবুআনি ব্যথিত হত বলে, তাঁরা পাড় ছিঁড়ে কাপড় পরতেন।

এই ছিল হাটখোলার দত্তদের অবস্থা। তাঁদের সংসারে থেকে কত লোক যে অবস্থা গুছিয়ে নিল, তার হিসাব নেওয়া কঠিন। এবং দয়া-দাক্ষিণ্যে দত্তরা ছিল সত্যি-সত্যি বদান্য। এঁদের বাড়িতে সামান্য কাজ করতে করতে কী ভাবে একজন ধনী হতে পারেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন রামদুলাল দেব ওরফে রামদুলাল সরকার।

এই রামদুলাল ছিলেন ছাতুবাবু লাটুবাবুর বাবা। রামদুলাল মদনমোহন দত্তের কাছে বিল সরকার হিসাবে কাজ করতেন পাঁচ টাকার মাইনেতে। কয়েক বছর পরে প্রমোশন হল। মাইনে হল দশ টাকা। তখন তিনি কাজ আরম্ভ করলেন জাহাজ সরকারের। টুল্লো কোমপানির অফিসে তিনি একদিন প্রভুর অনুমতি ছাড়াই

একটি ডাক দিয়ে বসেছিলেন নিলামের। একটি জলমগ্ন জাহাজ বিক্রয় হচ্ছিল। চৌদ্দ হাজার টাকায় প্রভুর পক্ষে সেটি কিনে নিচ্ছেলেন রামতুলাল। হঠাৎ সেখানে নাটকীয়ভাবে এক সাহেব ঢুকলেন। এবং কোমপানির ঘরে রামতুলালের টাকা জমা পড়ার আগেই, সেটি সাহেব রামতুলালের কাছ থেকে কিনে নিলেন এক লাখ টাকায়। রামতুলাল এসে সেদিন খুব খুশি মনেই এ লাভের টাকা এনে তুলে দিলেন প্রভুর হাতে। একপয়সাও খরচ না করে এক লাখ টাকা রোজগার, এ কী কম কথা!

হাটখোলার দত্ত মশাই অবাক হয়ে গেলেন রামতুলালের সততায়। কেননা, এ টাকা রামতুলালের বুদ্ধিতেই অর্জিত। দত্তবাবুর অর্থে নয়। এবং এ টাকা কোনো জাহাজ-সরকারই প্রভুর হাতে তুলে দিত না। কখনও না।

দত্তমশাই ভারি সন্তুষ্ট হলেন। সব টাকাটাই তিনি খুশি মনে ফিরিয়ে দিলেন রামতুলালের হাতে। রামতুলালও অবশ্য মর্যাদা রেখেছিলেন এ টাকার। খাটিয়ে ভালো ভাবেই ব্যবসা করেছিলেন এবং অনেক দান ধ্যান করেছিলেন। আর মৃত্যুকালে এই পাঁচ টাকা মাইনের বিল সরকার তাঁর ছেলেদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। আর রেখে গিয়েছিলেন দত্তদের প্রতি চিরকালীন আনুগত্য।

কালীঘাটের কালীমন্দিরের সঙ্গে এসব কাহিনীর অবশ্য কোনো যোগ নেই। বাবুদের যে ক্ষীণ যোগ ছিল, তা হল কালীর সঙ্গে। কেননা, সেকালের এসব বাবুরা মাঝে-মাঝেই ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো নিয়ে আসতেন কালীঘাটে। দেখতেন কালীঘাটের জীর্ণ মন্দির। নতুন করে এ মন্দির তৈরী করা যে দরকার, এ সব ধনকুবেররা কোনোদিন ভাবতেন না। কোনোদিন না। আসতেন মল্লিকরা। আসতেন পাইকপাড়ার রাজারা। কেউ দিতেন সোনার মুকুট। কেউবা রূপোর হাত। সোনার ছাতাও মা একবার পেয়েছিলেন।

শোভাবাজার থেকেও এ ধরনের পূজোই আসত। সে পূজোয় খুবই ঢাকঢোল বাজত।

কিন্তু কে জানত, বাবুদের কলহের ভেতর দিয়ে মন্দির নির্মাণের ভূমিকা তৈরী হচ্ছে! কে জানত এ রেষারেষির ভেতর এসে যাবেন বৃদ্ধ সন্তোষ রায় এবং হাটখোলার দত্তদের প্রতি সেই কৃতজ্ঞ মানুষ রামদুলাল সরকার!

যাই হোক, আগের কথা আগে বলে নেওয়া দরকার। এবং সে কথা বলতে গেলে শোভাবাজারের রাজবাড়ির কাছেই হাটখোলার দত্তবংশীয় যে চূড়ামণি দত্ত থাকতেন, তাঁকে নিয়েও দুকলম লেখা দরকার।

হঠাৎ-রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠাকে স্বীকার করতেন না চূড়ামণি। কোনো রকমেই না। বরং সর্বদাই চেষ্টা করতেন যাতে নবকে হেয় করা যায়। তাই কারণে অ-কারণে বাধিয়ে বসতেন বিবাদ। লাগিয়ে দিতেন টক্কর। কায়স্থ সন্তান চূড়ামণি এ সব খেয়ালে পয়সা খরচ করতে দ্বিধা করতেন না। ভালোবাসতেন রগড়।

একবার পারিবারিক একটি অনুষ্ঠান বসেছে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বাড়ি। ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে প্রাসাদ। অতিথিরা আসছেন একে একে। বহুমূল্য গালিচা, কিংখাপের সমারোহ এবং আলোর ঐশ্বর্যে অনেকেরই চোখ যাচ্ছে ধাঁধিয়ে।—সে সভায় চূড়ামণি দত্তের মেয়েও ছিলেন নিমন্ত্রিত। এলেন তিনি। আর কী আশ্চর্য, সে সভায় চূড়ো দত্তের মেয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলে গেল গোটা মণ্ডপের। মাথার ওপর ছিল লাল রঙের সামিয়ানা। মুহূর্তের ভেতর সেটি ময়ূরপঙ্ক্ষীর রঙ ধারণ করল। আর চারদিক থেকেই বেরোতে থাকল এক আশ্চর্য জ্যোতি।—সকলে অবাক। মহিলারা হতবাক। রাজা নবকৃষ্ণ নিজেও কৌতূহলী হলেন। এবং জানলেন যে চূড়ো দত্তের মেয়ের হাতে একটি আশ্চর্য অঙ্গুরীয় আছে। তাতে

খচিত আছে বহুমূল্য নীলকান্তমণি। সেই মণির প্রভাবেই ঘটেছে এ বর্ণবিপর্যয়।

রাজা নবকৃষ্ণ উৎসুক হয়ে হাতে নিয়ে দেখলেন আঙটিটি এবং নীলকান্তমণি। তারপর অনেক প্রশংসা করে চূড়ো দত্তের মেয়ের হাতে প্রত্যার্পণ করলেন সেটি।

এদিকে মেয়ে যথাসময়ে বাড়ি ফিরে সব কথা চূড়ো দত্তের কাছে নিবেদন করলেন। চূড়ো দত্ত লুফে নিলেন সুযোগটি। পরের দিন আরো পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে আঙটিটি উপঢৌকন পাঠালেন নবকৃষ্ণের কাছে। অর্থাৎ কান মুলে যেন জানিয়ে দিলেন, 'বাছরে', এ সব জিনিসতো সাতপুরুষে দেখোনি। এখন দেখে চক্ষু সার্থক কর।'

রুচির সূক্ষ্ম লড়াইয়ে বেচারি নবকে হার স্বীকার করতেই হল।

আরেকবার এক ব্রাহ্মণ এসেছিল শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। হাতে একটি ছোট পাথর বাটি। রাজবাড়িতে ঢোকার পর তার দেখা হয়ে গেল নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গোপীমোহনের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে রাজপুত্রের কাছে নিবেদন করল, 'প্রভু, আমার ছেলের কানে ব্যথা। সম্ভবতঃ কান পেকেছে। যদি এক ফোঁটা পচা আতরও দেন, তবে বড়ো উপকার হয়। বেচারি কানে লাগাতে পারে।'

ব্রাহ্মণের এ প্রার্থনা শুনে হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল রাজকুমারের মাথায়। কৌতুক করে বলল, 'ঠাকুর, এখানে এসে তোমার বেশ সুবিধা হবে না। তুমি বরং যাও চূড়ো দত্তের কাছে। বাবুর বাড়িতে অঢেল আতর। তবে তাঁর মেজাজটি বড়োই চড়া। ঐ ছোট পাথরের বাটি নিয়ে গেলে তিনি ভীষণ রেগে যাবেন। তাঁর কাছে যাও, তবে সঙ্গে নিয়ে যাও একটি কলসী।'

ব্রাহ্মণটি ছিল সরল চিত্ত। সে তাই করল। কলসী নিয়ে গুটি গুটি গিয়ে হাজির হল এবং সব কথা নিবেদন করল চূড়ো দত্তের কাছে।

চূড়ো দত্ত সে সময় তেল মাখছিলেন বসে বসে। একটু বাদেই হয়ত যাবেন চান করতে। ব্রাহ্মণের কথা শুনে হেসে উঠলেন তিনি হা-হা করে। তারপর আদুরে ছেলে কালীপ্রসাদকে ডাকলেন। বললেন, 'গন্ধী আতরওয়ালকে এখনই ডেকে পাঠা, কালী। এখনই। এই ব্রাহ্মণকে এক কলসী আতর এনে দে। এ আতর দেওয়ার পর আমি চান করব।'

চূড়ো দত্ত বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন নবকৃষ্ণের থেকে। তাই রাজা হলেও শোভাবাজারের মালিককে তিনি নাম ধরে 'নব' বলেই ডাকতেন। এবার ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'দেখ ঠাকুর তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে যে, ঐ গুপী ছেলেমানুষ। তুমি বরং এ আতরটা নবকে গিয়ে দেখিয়ে এসো; বোলো যে আমি দিয়েছি।'

যথারীতি ব্রাহ্মণ এ কলসী নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এলো নবকৃষ্ণকে। তারপর ফিরে এলো চূড়োর কাছে। চূড়ো ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ঠাকুর, এত টাকার আতর নিয়ে কি করবে তুমি? এ আতরের দাম আড়াই হাজার টাকা। তুমি বরং আড়াই হাজার টাকা নিয়ে যাও, আর নিয়ে যাও প্রয়োজনমত সামান্য একটু আতর। এতে তোমার উপকার হবে।'

ব্রাহ্মণ তাই করল। বাড়ি গেল সে আশীর্বাদ করতে করতে। আর এদিকে রাজা ধমকাতে আরম্ভ করলেন গোপীমোহনকে ডেকে।

এইভাবে নিত্য লেগে থাকত রেষারেষি। নিত্য। ছেলেদের মধ্যেও ছিল প্রতিযোগিতা এবং তাও রোমাঞ্চকর। সেকালের বাবুরা যে ধরনের বাবুগিরি ও বিলাসিতা পছন্দ করতেন, এঁদের গতি ছিল সেদিকে। নবাবী জাঁক-জমক আর আমিরী মেজাজ ভালোবাসতেন এঁরা।

সেকালের কলকাতায় বিবি আনার নামে ছিল এক পরমাসুন্দরী মুসলমান রমণী। সে বিবির রূপের রোশনাইয়ে অনেকেরই চোখ

গিয়েছিল ধাঁধিয়ে। অনেক বাবুই চেয়েছিল সেই পঞ্চদশী বিবিকে আয়ত্ত করতে, কিন্তু সকলকে হটিয়ে দিয়ে তাকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল যে সে আর কেউ নয়, চূড়ো দত্তের ছেলে কালীপ্রসাদ। লক্ষ্ণৌ ফ্যাশানে তার মত রপ্ত ছিল না কেউ সহর কলকাতায়। সে ছিল যেমনি বিলাসী, তেমনি কেতা দুরস্ত। চুড়িদার পায়জামা ও রামজামা পরে, কোমরে দোপাটা বেঁধে এবং মাথায় বাঁকাটুপি হেলিয়ে দিয়ে বাবু কালীপ্রসাদ যখন পথে বেরত তখন পথের লোক 'আহা আহা!' করে উঠত। সাড়া পড়ে যেত খ্যামটা ও বাইজী মহলে।

বিবি আনারকে নিয়ে বাবু কালীপ্রসাদ রীতিমত সাড়া তুলেছিল সেকালে। তার কাছেই অনেক নিষুতি রাত পর্যন্ত পড়ে থাকত বাবু। কখনো বা রাত কাটাত অকুস্থলেই। যবনীর সঙ্গে উতরোল হয়ে উঠত অনেক মধুরাত।

ওদিকে নবকৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্র রাজকৃষ্ণের যবনীবিলাসও ছিল নাম করা। চূড়োর ছেলে কালীপ্রসাদের সঙ্গে এ খেয়াল যেন চলত পাল্লা দিয়ে। কেবল যবনী সহবাস নয়, মুসলমান বাবুর্চি ছাড়া বাবুর আহার্য ভালো লাগত না। তাঁর সকল সভাসদ ও সহচর ছিল মুসলমান। শুধু কি তাই? গান লিখতেন তিনি মহরমের। এবং মহরমের শোভাযাত্রায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি চলতেন সকলের আগে। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর উত্তরোত্তর বেড়েই গেল এ বিলাস।

যাইহোক, পাল্লা দিয়ে বংশানুক্রমে এইভাবেই রেষারেষি চলছিল রাজবাড়িতে দত্তবাড়িতে। চলছিল মনকষাকষি। এই 'টাগ অব ওয়ার' যখন চরমে, ঠিক সেই সময় শোভাবাজারকে অনাথ করে দিয়ে দুম করে মারা গেলেন নবকৃষ্ণ স্বয়ং। সেবার সতেরোশ সাতানব্বই। শীতকাল। নভেম্বর মাসের বাইশ তারিখ। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছিলেন রাজা মশাই। হঠাৎ এলো

ঘুম। কাল ঘুম। বেলা ছুটো নাগাদ চাকর ডাকতে এসে দেখে যে রাজামশাই মরে কাঠ। ঠিক কখন যে মারা গেছেন, তার ঠিক নেই।

সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রাজার সাত রাণী কেঁদে আকুল। কিন্তু ওদিকে! ওদিকে হাসতে থাকল শত্রু। কেননা, এ মৃত্যু সেকালে ছিল খুবই নিন্দনীয়।—এ আবার মৃত্যু নাকি? অর্ধেক দেহ শোয়ান থাকল না গঙ্গাজলে, কানের কাছে নাম করল না কেউ ঠাকুর-দেবতার,—অঙ্গে রইল না হরিনামমৃত, সুতরাং এ আবার মৃত্যু নাকি! —তাই রাজার এ মৃত্যুতে রাজ বাড়িতে যতই শোকের ছায়া পড়ুক না কেন, বাইরেতে ছড়িয়ে পড়ল চাপা কেচ্ছা! এবং সে খবর যথাসময়ে পৌঁছুল গিয়ে রাজবাড়িতে।

এদিকে চূড়ো দত্ত দীর্ঘদিন ছিলেন অসুস্থ। তিনি নবকৃষ্ণের এ মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন চ্যালেঞ্জ হিসাবে। সার্থক মৃত্যু কাকে বলে তা দেখাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন মনে মনে।

কিছুদিন পরে যখন তিনি খুবই দুর্বল বোধ করলেন, তখন ডেকে পাঠালেন পুত্র কালীপ্রসাদকে। বললেন, 'বাবা, আমার কাল ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর।'

কালী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'কী ইচ্ছে, বাবা?'

চূড়ো দত্ত বললেন, 'আমার অন্তর্জলী যাত্রার ব্যবস্থা কর। আমি একটি গান লিখেছি, এ গানটি গাইতে গাইতে নিয়ে চল আমাকে শোভাবাজারের রাজবাড়ির সামনে দিয়ে।'

ব্যস, যে কথা সেই কাজ। ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চূড়ো দত্ত চললেন গঙ্গায়। বসানো হল তাঁকে কিংখাপের গদিতে. রূপোর চতুর্দোলায়। আগে পিছে চলল ঢাক-ঢোল আর খোল-কত্তাল। দলে দলে লোক চলল লাল পতাকা নিয়ে। চতুর্দোলার মাথায় রইল নামাবলীর চন্দ্রাতপ। তুলসীমালার ঝালর। আর চারদিকে তুলসী গাছ। চূড়ো দত্ত রক্ত রঙের চেলী পরে, নামাবলী

গায়ে জড়িয়ে এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন জপের মালা নিয়ে। ওদিকে কীর্তনের সুরে গায়করা গান ধরল :

'জগৎ জিনিয়া চূড়া—যম জিনিতে যায়।
ও নবা, তুই দেখবি যদি আয়।
আয়রে আয়—নগরবাসী !
দেখবি যদি আয়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়ো, যম জিনিতে যায় !
জপ-তপ কর কী, মরতে জানলে হয়।
ও নবা, তুই দেখবি যদি আয় !'

রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে দত্তমশায়ের লোকেরা এ গান গাইল। নবকৃষ্ণের মৃত আত্মার প্রতি এ অবজ্ঞা এবং মৃত্যুর প্রতি কটাক্ষ অনেকের কাছেই হয়ে উঠল অসহ্য। তবু সেদিনের এ অপমান নীরবে সহ্য করল রাজবাড়ি। এবং প্রতিশোধের জন্য রইল অধীর প্রতীক্ষায়। উপযুক্ত মুহূর্তের সন্ধানে।

ওদিকে বুড়ো চূড়ো দত্ত মারা গেলেন যথাসময়ে। আর তারপর সাজো সাজো রব পড়ে গেল শ্রাদ্ধের জন্য। বিবি আনারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কয়েক দিনের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হলেন কালীপ্রসাদ।

সেকালের বাবুদের যা কিছু গৌরব তা সাধারণত প্রকাশ পেত শ্রাদ্ধের আড়ম্বরে। লাখ লাখ টাকা ব্যয়িত হত এ অনুষ্ঠানে। অজস্র লোককে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করা হত। বিদায় দেওয়া হত দেশ-দেশান্তরের ব্রাহ্মণদের। মোট কথা, সে এক এলাহি ব্যাপার ঘটে যেত।

আর এ অনুষ্ঠানকে যদি কোন রকমে পণ্ড করে দেওয়া যেত, তবে তার থেকে শত্রুপক্ষের পক্ষে সুখের ব্যাপার আর কিছুই ছিল না! শোভাবাজার অন্য কোনো পথ না পেয়ে, বেছে নিল এই

নিকৃষ্ট রাস্তা। বিবি আনারের সঙ্গে কালীপ্রসাদের সম্পর্ক তুলে তাঁরা এ শ্রাদ্ধ বয়কট করতে উদ্যত হলেন। সহরের ঘরে ঘরে আড্ডায় আড্ডায় এবং বাবুদের আসরে আসরে উতরোল হয়ে উঠল কালীপ্রসাবের কুৎসা। এমন কী তৈরী হল নতুন নতুন গান। পাড়ায় পাড়ায় শোনা গেল, 'গেল গেল হিন্দুয়ানী।'

সহরের কায়স্থকুল বেঁকে বসল। কালীপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। উপায়? —কী উপায় হবে? সবই কা তা' হলে পণ্ড হয়ে যাবে?

ঠিক এমনি যখন অবস্থা, তখন ডাক পড়ল দত্তবাড়িব সেই হিতৈষী মানুষটির অর্থাৎ বামদুলাল সরকারের। রামদুলাল সেদিন সমাজের মাথা। বিত্তেও তিনি অনেকেব ওপরে। সব কথা শুনে তিনি বললেন 'বটে। এই ব্যাপাব। কালীপ্রসাদকে নিয়ে ওরা চায় হাঙ্গামা বাধাতে? বেশ ঠিক আছে। দেখা যাবে।' তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে পাড়াব মাতব্বরদের ডেকে বলেছিলেন হেসে হেসে, 'ভায়া হে, জাত আমাদেব বাকসেব ভেতর। বাকস থেকে টাকা বের করে ছড়িযে দিতে পারলেই সব ব্যাটা চুপ!'

বামদুলাল কেবল কথা বলেই নিরস্ত থাকেননি, লেগে গেলেন কাজে। পবেব দিন অতি প্রত্যুষে নৌকো করে পাড়ি দিলেন দক্ষিণেব দিকে। প্রথমে গিয়ে পৌঁছুলেন কালীঘাট। সেখানে মায়ের পূজা দিলেন তাবপব সেখান থেকে সোজা গিয়ে উঠলেন কালীর সেবাইত ও পবম ভক্ত সন্তোষ রায়ের কাছে। সেই সন্তোষ রায়, যিনি গোটা পাঁঠা খেয়ে চমকে দিয়েছিলেন আলীবর্দীকে আর পেয়েছিলেন 'খোবাকী মহল।'

সন্তোষ রায় তখন বৃদ্ধ। শালপ্রাংশু মহাভুজ সেদিন লোল-চর্মধারী। তবু সন্তোষ বায মানেই সন্তোষ রায। মরা হাতী লাখ টাকা। তখনো তাঁর ডাকে হাজার হাজার লোক এসে একত্র হয়। ওঠে বসে তারা সন্তোষ রায়ের কথায়।

গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে তিনি শুনলেন সব কথা। রাম-দুলাল নরমে-গরমে পরিবেশন করলেন রাজবাড়ির শত্রুতার বিবরণী। কায়স্থ সমাজের বিরূপতার কথা। এবং সব তথ্য নিবেদন করে প্রার্থনা করলেন আশ্রয়।

আশ্রয় দিলেন সন্তোষ রায়। বললেন, 'চিন্তা নেই। আমার ব্রহ্মোত্তর ভোগী ব্রাহ্মণ আছে হাজার হাজার। তারা যাবে শ্রাদ্ধে।

সত্যি সত্যিই হাজারে হাজারে ব্রাহ্মণ এলো শ্রাদ্ধের দিন। এলো অনেক কায়স্থ সন্তানও। রামদুলাল সরকার রসিয়ে রসিয়ে বললেন বড়ো বড়ো মাতব্বরদের: 'ভায়া হে, জাত আমাদের বাকসের ভেতর, কী বল? টাকা ঢাললেই সব মিটে যায়।'

স্বয়ং সন্তোষ রায়ও এলেন বড়িশা থেকে। কালীপ্রসাদ শ্রাদ্ধ শেষে সন্তোষ রায়কে প্রণাম করে পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন ব্রাহ্মণ বিদায়ের জন্য।

সন্তোষ রায় হা-হা করে হেসে উঠলেন। ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন, 'কালীপ্রসাদ আপনাদের বিদায়ের জন্য অনেক টাকা দিয়েছে। অনেক টাকা। এ টাকা কী আপনারা নেবেন? যদি নেন, লোকে বলবে টাকার লোভে পড়ে এই বামুনঠাকুররা এক পতিত-ব্যক্তির পণ্ড পিতৃশ্রাদ্ধ উদ্ধার করছে। এই অপবাদ কী ভালো হবে? তার চেয়ে বরং একটি ভালো কাজে লাগানো যাক টাকাটা—কী বলেন?'

'কী ভালো কাজ?' সকলের মনেই উদ্যত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন।

সন্তোষ রায় বললেন, 'আসুন, এ টাকা দিয়ে আমরা কালীঘাটে মায়ের একটা ভালো মন্দির বানিয়ে দিই, কী বলেন?'

সন্তোষ রায়ের কথায় সকলে 'সাধু সাধু' বলে উঠল। রামদুলাল বললেন, 'এই না হলে সন্তোষ রায়!' সন্তোষ রায় বললেন, 'ব্রাদার হে, এই হল আমার আসার খোরাকী।'—আর এসবই মায়ের লীলা!'

পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজায় রাজায় রেষারেষি এবং কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা এসে শেষ হল কালীঘাটের মন্দিরে। শ্রাদ্ধ যে মন্দির পর্যন্ত গড়াবে তা কে জানত? চূড়ো দত্ত বা নবকৃষ্ণ কেউই জানতেন না যে তাঁরা দলাদলি করে পরোক্ষভাবে কাজ করে চলেছেন মায়ের। আর কালীপ্রসাদের নাম সার্থক হল মায়ের কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়ে। এবং মায়ের সেবায় লেগে। প্রসাদ পেয়ে।

সেকালের মন্দিরের চারদিকে পাঁচশ পঁচানব্বই বিঘে জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছিলেন সন্তোষ রায়। এখন সে মন্দিরের মাঝখানে আট কাঠা জায়গার ওপর তৈরী হল নতুন মন্দির। মন্দিরটি তৈরী হতে সময় লাগল আট বছর। এবং অর্থ লাগল তিরিশ হাজার টাকারও বেশি। ষাট হাতের মতন করা হল মন্দিরের উচ্চতা। আর ভেতরে পরিসর রাখা হল পঞ্চাশ হাতের মতন।

এ মন্দির তৈরী করতে করতেই একদিন দেহ রাখলেন সন্তোষ রায়।

সন্তোষ রায়ের অসমাপ্ত কাজ সমাধা করলেন তাঁর পুত্র রামলাল রায়। এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন। এঁদের তত্ত্বাবধানে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হল। —সেদিনের তারিখ? —তখন উনিশ শতক এসে গেছে। সেদিনের তারিখ আঠারোশ ন সাল।

মায়ের নতুন ভক্তরা নতুন মন্দিরে চলল পুজো দিতে। এ পুজোর সময় সশরীরে চূড়ো দত্ত বা নবকৃষ্ণ কেউই উপস্থিত ছিলেন না বটে, ছিলেন না সন্তোষ রায়ও, কিন্তু তাঁদের বৈদেহী আত্মা যে এই পুজো দেখে তৃপ্ত হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কী? যিনি পুতুলের মত আমাদের নিয়ে খেলা করছেন, সেই নায়িকার লীলা কে বোঝে?

কালীর কথা এখানেই ফুরোল। কলকাতার ইতিহাসে এই একজনই মাত্র নায়িকা যিনি অন্তরালে থেকে সব ঘটনার নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কলকাতার কথায় তাঁর কথা বাদ দেওয়া চলে না, তাই নেটিবদের পটভূমিকায় তাঁর ছবি আঁকতে হল।

কলকাতার নায়িকাদের ইতিহাস কিন্তু সাদা সাহেবদের নিয়ে। তাই সাদা নায়িকাদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। ফিরে আসা যাক, নীলনয়নাদের প্রেমে। তাদের দুঃখে, তাদের ভালোবাসায়।

আসা যাক মানবীদের প্রেমে।

তিন

কবি মানসী রোজ ও পার্ক স্ট্রীটের সমাধি

কোথায় কবি আর কোথায় কবি-মানসী ! কোথায় কলকাতার পার্কস্ট্রীট আর কোথায় সুদূর ইংলণ্ডের ছোট্ট একটি গ্রাম। না, ওটা ইংলণ্ড নয়, ও গ্রামটি ওয়েলসের সমুদ্র তীরে।

ফ্লোরেন্সে বসে ইটালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ওয়ালটারের এই সব নানা চিন্তা মনে আসত। জীবনের অপরাহ্নে গোধূলির ক্ষীণ আলোকে দাঁড়িয়ে তিনি ফিরে যেতে চাইতেন চৌষট্টি বছর আগেকার প্রথম যৌবনে। যদিও তিনি কখনো কলকাতায় আসেন নি, তবু ভাবতে চেষ্টা করতেন কলকাতার কথা। মার্চ মাসের বাঙলা দেশ, অপরিচিত পাখিদের কাকলি, তরঙ্গ-সঙ্কুল কলকাতার গঙ্গা এবং যেখানে রাজা-রাজড়ারা সমাসীন, শ্বেত বিচারকেরা ন্যায়দণ্ড নিয়ে বসে আছেন—'হয়ার প্রিন্সেস্ স্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড জাজেস সীট', এদের স্মৃতি কবি বয়ন করতেন তাঁর কল্পনা দিয়ে। কেননা কবির হৃদয়ের বৃন্তে যে গোলাপটি ফুটেছিল তা ওখানেই ঝড়ে পড়ে।

ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর একটি বিখ্যাত নাম। সতেরোশ পঁচাত্তর সালে তিনি যখন সুদূর ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন তখন এদেশে রামমোহন রায় টলমল করে চলে বেড়াচ্ছেন—তিন বছরের শিশুমাত্র। নন্দকুমার রায় ফাঁসীতে ঝোলেন এই বছর, আর মাদাম গ্রাণ্ডের শয়নকক্ষে নিশীথ অভিসারে ধরা পড়ার অপরাধে বেচারি ফিলিপ ফ্রানসিসকে এই বছরই জরিমানা দিতে হয় পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকা। যাইহোক,

আমাদের এই শহর কলকাতায় যখন হেস্টিংসের যুগ চলছে, সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তে ওয়ালটারের জন্ম। আর ওদিকে? কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের পাঁচ বছর পরে এঁর জন্ম আর মারা গিয়েছিলেন ওঁর চোদ্দবছর পরে। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের বিরাট একটি যুগকে ধরে রেখেছিলেন ওয়ালটার ল্যাভেজ ল্যাণ্ডর। রোমান্টিক যুগের সঙ্গে ভিক্টোরিয় যুগকে তিনি গেঁথে দিয়েছিলেন এক জীবনসূত্রে।

সেবার সতেরোশ সাতানব্বই সাল। সাতষট্টি বছরের এপারে জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে এই বছরটির কথা ভুলতে পারেন না ল্যাণ্ডর। চিকিৎসকের ছেলে ছিলেন তিনি। ওয়ারউইকে তাঁর জন্ম আর শৈশবও কেটেছে ওয়ারউইকে। তারপরে অক্সফোর্ডে এলেন পড়াশোনা করতে। সুন্দর ঝকঝকে ছেলে ওয়ালটার ল্যাণ্ডর। সুন্দর কবিতা লেখেন। বছর কুড়ি পরেই ওয়েল্‌সের সমুদ্রতীরে বেড়াতে এলেন তরুণ কবি। গ্রামটির নাম সোয়ান-শী। নির্জন ছোট্ট গ্রাম। পুরনো নাম ছিল আবারতোই। কে বা কারা এই নতুন নামকরণ করেছিল তা ওখানকার গ্রাম বৃদ্ধরাই হয়ত বলতে পারতেন।

যাইহোক, এই সমুদ্র সৈকতে এসে ওয়ালটার ল্যাণ্ডর নতুন করে আবিস্কার করলেন নিজেকে। যে সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে কল্পনা দিয়ে একটু একটু করে এঁকে চলেছিলেন তরুণ কবি, তাকে চোখের সামনে সমুদ্রতীরের এই আশ্চর্য নির্জন পরিবেশে বাস্তবায়িত দেখলেন।

গোলাপের নামে নাম। মেয়েটির নাম রোজ। রোজ হোয়াইটওয়ার্থ এ্যালমার। কুঁড়ি থেকে সদ্যবিকশিত হচ্ছেন সপ্তদশী। গোলাপের পাপড়ির মত স্নিগ্ধ মাধুর্য কিশোরীর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। দুটি উজ্জ্বল চোখ, পিছনে নেমেছে সোনালি চুলের ঢেউ।—অক্সফোর্ডে-পড়া ওয়ালটারের সঙ্গে সোয়ান-শীর সমুদ্র বেলায় এই নায়িকার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এ যেন কুঁচবরণ কন্যার সঙ্গে দুধবরণ রাজপুত্তুরের সাক্ষাৎকার। চার চোখে দৃষ্টি

বিনিময় হল। সঙ্গে সঙ্গে মন বিনিময়ও। তারপর দুজনে পথ হারাল হৃদয়-অরণ্যে।

এ্যলমার পরিবার সে সময় এই সোয়ান-শীতেই ছিল। পরিবারের মাথা লর্ড হেনরী এ্যলমার ছিলেন বনেদী ঘরের মানুষ। লেডি এ্যলমারও এসেছিলেন আরেক অভিজাত ঘর থেকে। স্যার চাস হোয়াইটওয়ার্থ ছিলেন লেডি এ্যলমারের বাবা। সেকালের তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর দুটি কন্যাকে দুটি ভালো জামাই দেখেই পাত্রস্থ করেছিলেন। এক জামাইতো এই, আরেক জামাই ছিলেন রাসেল সাহেব। তাঁর নামও হেনরী। ইনি আরেক কৃতি সন্তান।

এহবাহ্য, ওয়ালটারের কাছে সেদিন এসব জানার দরকার ছিল না। তরুণ কবি সেদিন কেবল একজনকেই চিনতেন, আর সেই একজনের দেখা পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করে পথ চেয়ে থাকতেন। তারপর দেখা হলে দুজনে ঘুরে বেড়াতেন। ওক গাছের ছায়ায় ছায়ায় কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সামনে গর্জমান সমুদ্র। সমুদ্রের কোলে কোলে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায় ওরা। দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা। কথা বলে আরো এলোমেলো, অর্থ হারা ভাবে ভরা ভাষা। এখানে সমুদ্রতীরে পাথুরে মাটি। এ মাটিতে জন্মায় নানা ধরণের গুল্ম, দেখা যায় এলোমেলো ঝোঁপ। নানা জাতের ফুল গাছ। হ্যাঁ, নানা জাতের। তাতে গোলাপও আছে। সেই গোলাপ ওরা কাড়াকাড়ি করে তোলে। কে কত বেশি তুলতে পারে, চলে তার প্রতিযোগিতা।

তারপর? তারপর ক্লান্ত নায়িকাকে সযত্নে পাশে বসায় নায়ক। ওরা ঘন হয়ে বসে। বসে নিবিড় হয়ে। হাতে সদ্য তোলা গোলাপ। নায়িকার হাতে কত?—নায়কের হাতে অন্ততঃ আট-দশটা। এইট অর টেন! আর নায়িকাতো নিজেই গোলাপ-কুমারী। এরপরে নায়কের জবানীতে—'উই বোথ অয়ার স্নাগলি সীটেড দেন্' —। ঘনিষ্ঠভাবে বসে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে কথা বলতে গিয়ে চমকে ওঠে

নায়িকা, ককিয়ে ওঠে। হঠাৎ নায়িকা গোলাপ দেখতে পায় গোলাপের কাঁটায় নায়কের হাত ক্ষত বিক্ষত। বিন্দু বিন্দু রক্ত!

বেদনার ছায়া পড়ে সপ্তদশী রোজের চোখে মুখে, 'গুড গ্রেসাস! —একী তোমার রক্ত বের হচ্ছে কেমন করে?—হাউ ইউ ব্লিড!'

ওয়ালটার তখন হাতটা এগিয়ে দেয়।

কিশোরী রোজ বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে মুছে দেয় রক্ত বিন্দুগুলি। স্পর্শ করে ক্ষতস্থান। শঙ্কিত চিত্তে শুশ্রূষা করে। তারপর যত্নে হাতটিকে সে তুলে নেয় নিজের উরুর ওপর।

উঃ! সে এক আগুনভরা মুহূর্ত! সে উত্তেজনার কথা স্মরণ করলে আজো লোম খাড়া হয়ে ওঠে ওয়ালটারের। বৃদ্ধের শীতল রক্তে আসে কল্লোলিত উষ্ণতা।

এদিকে ওয়ালটারের হাতটি শুয়ে থাকে তরুণী রোজের কোলে। স্পর্শে যে এত আবেগ কে জানত?—বিভোর হয়ে যায় ত্বজন ত্বজনের ছোঁয়ায়। হাতটি তখন যেন প্রতীক। তাই হাতটিকে ফিরিয়ে নিতে পারে না ওয়ালটার। কেননা তুলতে গেলেই আরেক বিচ্ছেদ। তখনই সুর কেটে যাবে। ছিঁড়ে যাবে সুখ। হৃদয়ের ক্ষত যেন ফেটে পড়বে বেদনায়।

সেদিনের এ মুহূর্তটি অনন্ত মুহূর্ত করতে চেয়েছিল কবি ওয়ালটার। মনে মনে বারবার শপথ নিয়েছিল, আমি একে চিরন্তন করব। যখনই কান পাতব আমি কবিতায়, তখনই যেন শুনতে পাই সেই ভালোবাসার কথা গুলি।

রোজ শুইয়ে রাখে হাতটিকে। অনুচ্চারিত অস্ফুট ভাষায় আদর করে। আর এ মর্মে কবি লেখেন,

> She coax'd it to lie quiet there
> With a low tune I bent to hear;
> How close I bent I quite forget,
> I only know I hear it yet.

অর্থাৎ কবির জবানীতে বলা যায়, ঐ ক্ষীণ অস্ফুট আদরের স্বর শোনবার জন্য আমি ঝুঁকে পড়ি। ঘনিষ্ঠ হই, কিন্তু কতখানি ঘনিষ্ঠ, তা ঠিক মনে নেই। তবে যা শুনেছি, তা যে এখনো শুনতে পাই, সে আমি জানি।

যাইহোক, নায়ক-নায়িকা দুজনেই এ ভাবে প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু যেতে থাকল।

মাঝে মাঝে তরুণী রোজ আবার বই নিয়ে আসে। এ বই কখনো কবিতার, আবার কখনো বা গল্পের। সোয়ান-শী সারকুলেটিং লাইব্রেরীর বই। ওয়ালটার পড়ে এবং ফেরৎ দিয়ে দেয়। তারপর আবার বই আসে। একদিন সুন্দর একটি রোমান্সের বই নিয়ে এসে নায়িকা রোজ তুলে দিল ওয়ালটারকে।—অথার কে? বইটি হাতে নেবার পর এ কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল কবির। অথার একজন মহিলা। না, তেমন কোনো খ্যাতি ছিল না লেখিকার। তাঁর নাম ক্লারা রিভ। ওয়ালটার বাসায় ফিরে সেদিনই পড়ে ফেলল বইটিকে। না, তরুণ কবিকে মোহিত করতে পারলেন না লেখিকা। অক্সফোর্ডের কালচারে যার মন পরিশীলিত, শস্তা রোমান্সে কি তার মন ভেজে? —তবে শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠায় চোখ আটকে গেল ওয়ালটারের সত্যিকথা বলতে কী, মনও। এই পাতা কয়টিতে ছিল আরব রজনীর সেই মন মাতানো গল্প। উঃ! সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! এ কাহিনীর উদ্ভট রহস্যময়তা পেয়ে বসল কবিকে। আর মুহূর্তের ভেতর উদ্দীপিত হয়ে উঠল ওয়ালটারের কল্পনাশক্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটি কাব্যরচনার পরিকল্পনা ফেঁদে বসলেন। কাব্যটির নাম দিলেন, 'গেবির'।

'গেবির' কাব্য নয়, মহাকাব্য। প্রাচ্যদেশের একটি কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে তুললেন কবি এই কাব্য। পাগলের মত কবি লিখে চলেছেন। সে কী উন্মাদনা! কী উত্তেজনা।—কবি ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর সেই পাগল-করা দিনগুলির কথা কখনো

ভুলতে পারেন না। কখনো না। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিখে চলেছেন এই কাব্য।

সতেরোশ আটানব্বই সালে বের হল 'গেবির'। এ বছরটি ইংরেজি কাব্যমোদীদের কাছে আবার একটি স্মরণীয় বছর। কারণ? কারণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর কোলরিজের সম্পাদনায় 'লিরিক্যাল ব্যালাড' প্রকাশিত হয় এ বছরেই। কাব্য জগতে নতুন দিনের সূচনা ঘটে।

তা হোক, তা ঘটুক। গেবিরের কিন্তু তাই বলে কম আদর হল না। বাজারে যখন এই বইখানি বের হয়, তখন লেখকের নাম রাখা হয়েছিল গোপন। কাব্যটি পড়বার পর অনেকেরই ঔৎসুক্য দেখা গেল কে এর লেখক? সাদে ও শেলি দু'জনেই এ কাব্য পড়ে রীতিমত অনুপ্রাণিত হলেন। শোনা যায়, রবার্ট সাদে কেবল চুপি চুপি এটি পড়েন নি, এগিয়ে এসে সমালোচনা করেছিলেন। তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'এই গ্রন্থের অজ্ঞাত লেখককে দেখতে যদি আমাকে একশ মাইলও যেতে হয়, তা যেতে আমি প্রস্তুত।' আরেক বন্ধুকে লিখলেন, 'গেবির' নামে একটি কাব্য আছে, ঈশ্বর জানেন কে এর রচয়িতা, এক শিলিং মূল্যে এটি বিক্রি হয়, ইট হ্যাজ মিরাকিউলাস বিউটিজ—এ কাব্য অসাধারণ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ'।

হায়, এরা কি জানত ল্যাণ্ডরের এ বিস্ময়কর কাহিনীর উৎস ওয়েল্‌সের সমুদ্রতীর! সারকুলেটিং লাইব্রেরীর একটি অখ্যাত বই, আর সে বই যে এনে দিয়েছিল, সেই সপ্তদশী কিশোরীর উষ্ণ হৃদয় ছিল এ কাব্যের উৎস! না, একথা কেউ জানত না। খ্যাতির জগতে হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে গেল যে গোলাপী মেয়েটি, সে কিন্তু রয়ে গেল অন্তরালে।

ওদিকে গভীর সঙ্কট নেমে এলো সোয়ান-শীতে। এ্যালমার পরিবারের মাথা হেনরী আগেই মারা গিয়েছিলেন। তার জন্য যা সঙ্কট, তা তো ছিলই। এবার আরেক রকম বিপদের ছায়া পড়ল।

লেডি এ্যলমার—যাঁকে ঘিরে কয়েকটি গোলাপ নতুন বসন্তের স্বপ্ন দেখছিল, সেই মহিয়সী মহিলাই এক কাণ্ড করে বসলেন। হাউয়েল প্রাইস নামে এক ভদ্রলোককে রোজের মা বিয়ে করে ফেললেন। এ্যলমারের বিধবা হয়ে গেলেন মিসেস্ প্রাইস। যাই হোক, এই পুনর্বিবাহের ফলে সংসারটি ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। সুখের সংসারে নেমে এলো বিষাদ। মায়ের নতুন সংসারে রোজের আর ঠাঁই হল না।

স্যার চাস হোয়াইটওয়ার্থের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর আরেক জামাই ছিলেন রাসেল সাহেব। হেনরী রাসেল। ইনি ছিলেন রোজ এ্যলমারের মেসোমশাই। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অনাথিনী রোজ এসে আশ্রয় চাইল এই মেসোমশাইয়ের কাছে।

এবার রাসেল সাহেবের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। এই হেনরী রাসেল ছিলেন মাইকেল রাসেলের ছেলে। চার্টর হাউস ও কেমব্রিজের কুইন্‌স কলেজে করেছিলেন ইনি লেখাপড়া। পরে আইন পড়েন লিঙ্কন-ইনে। তারপর দীর্ঘকাল কোর্টের কাজে লিপ্ত থেকে সতেরোশ আটানব্বই সালে পাড়ি দেন কলকাতায়। ওয়ালটার যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, তার আগের বছর রেগুলেটিং অ্যাক্টের কল্যাণে কলকাতায় স্থাপিত হয় সুপ্রীম কোর্ট। যাই হোক ঐ কোর্ট স্থাপনার চব্বিশ বছর পরে পুইনি জজ্ হয়ে রাসেল সাহেব এলেন কলকাতায়। 'পুইনি জজ্' মানে বড়ো আদালতের ছোট জজ্। যাই হোক, ছোট জজ্ হয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করলেও, ছোট হয়ে রাসেল সাহেব কিন্তু থাকেননি। পরে তিনি নাইট উপাধি পেয়েছিলেন, ন বছরের ভেতরেই হয়েছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। আর ছয় বছর ধরে এ পদে বহাল ছিলেন। —কলকাতার ইতিহাসে হেনরী রাসেল একটি বিখ্যাত নাম। সেকালের চৌরঙ্গীতে থাকতেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এখানকার একটি রাস্তার নাম হয়, 'রাসেল স্ট্রীট'।

অনাথিনী রোজ আশ্রয়ের জন্য পাড়ি দিল কলকাতায়। কোথায় সোয়ান-শী, আর কোথায় কলকাতা! কেবল কন্যা রোজ নয়, কন্যার পিতা হেনরী এ্যলমারও কোনোদিন স্বপ্নে ভাবতে পারেন নি যে তাঁর মেয়ে ইংলণ্ডের থেকে আশ্রয়চ্যুত হয়ে নির্বাসনে যাবে কলকাতায়।

জাহাজ ভাসল সমুদ্রে। ওয়ালটারের কথা ও তার ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠল রোজের। ওয়ালটার তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। রোজেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সে আবার ফিরে আসবে তার জন্মভূমিতে। —দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় রোজ এই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই চলেছিল। অবিরাম ভেসে চলা। আরবের উপকূল দিয়ে যাবার সময় তার মনে পড়ে গিয়েছিল আরব্য উপন্যাসের কাহিনী। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল গেবিরের কথা। সেই সূত্রে মনে পড়ে গিয়েছিল ওয়ালটারকে। চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

শেষবেশ জাহাজ এসে পৌঁছুল চাঁদপাল ঘাটে। কলকাতায় পালকি চেপে রোজ গিয়ে উঠল মেসোমশায়ের চৌরঙ্গীর কুঠিতে। সাদা মানুষদের চোখে সহর কলকাতা যে-রূপে ধরা দেয়, রোজের চোখেও কলকাতা ধরা দিল সেই অকৃত্রিম চেহারা নিয়ে। প্রথম বিস্ময় পালকি, তারপর টানা পাখা। তারপর কলকাতার ধূলো ভরা রাস্তা। চাকর-বাকরদের চেহারা ও পোশাক-আসাকও তাকে কম বিস্মিত করল না। কালীঘাটের পথে হিন্দুরা কীভাবে দল বেঁধে পূজো দিতে যায়, অনেক দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অপরূপ দৃশ্য দেখল মিস্ এ্যলমার। না, সতীদাহ দেখে নি রোজ, কিন্তু সতীদাহের কাহিনী শুনতে শুনতে তার চোখ উঠেছে কপালে। ভয়ে কেঁপে উঠেছে বুক।

সহর কলকাতা তখনো সহর নয়। আসলে ঝোপ-জঙ্গল গাছ-গাছালি ও খানা ডোবায় ভরা একটি গ্রাম। অসংখ্য পাখির

কলরবে সকাল হয়, নানা রঙের পাখি নেচে নেচে বেড়ায় গাছের ডালে। দিনের বেলায় ভীষণ মাছি, রাত্তিরেতে তেমনি মশা। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই শোনা যায় শেয়ালের ডাক। তারপর প্রহরে প্রহরে ঠিক কয়েক ঘণ্টা অন্তর তারা ভয়ঙ্কর কলরব করেই চলে। রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় রোজের। কেমন যেন আতঙ্ক লাগে। ভয়ে শিহরিত হয়ে ওঠে সে। প্রাণপণে রোজ ভাবতে চেষ্টা করে ওয়ালটারকে। কেননা ওয়ালটারই একদিন তাকে এনে দেবে মুক্তি। ওয়ালটারই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে জন্মভূমিতে।

চৌরঙ্গী পাড়ায় বেশির ভাগই অবস্থাপন্ন সাহেবদের বাড়ি। এসব বাড়িতে আবার বেশির ভাগই পুরুষ বাসিন্দা। কেউবা বিবাহিত, কেউবা একবারে বিয়ে করেন নি। যাঁরা বিয়ে করেন নি, তাঁরা সাদা সঙ্গিনীদের আশায় জাহাজ ঘাটে গিয়ে ভিড় করেন। যদি জীবনসঙ্গিনী করা যায় কোনো মেয়েকে। সাদা মেয়েদের চাহিদা সেদিনের কলকাতায় তীব্রতর। ইউরোপ থেকে কোনো সাদা মেয়ে এলে তাকে ঘিরে ধরে পুরুষরা। একবারে মৌমাছির মতন।

রোজকেও ঘিরে ধরল ওরা। কিন্তু রোজ কোনো উৎসাহ পায় না। ওয়ালটারকে একবার যে ভালোবেসেছে, সে মেয়ে কী আর কাউকে ভালোবাসতে পারে ?

এদিকে কলকাতায় বিশ্রী জলহাওয়া মোটেই সহ্য হয় না রোজের। দিনে দিনে কেমন যেন সে শুকিয়ে যেতে থাকে। বিরহ আর বিষণ্ণতা হল তার নিত্যসাথী। রোজের অবস্থা দেখে মাসি লেডি রাসেল আড়ালে দীর্ঘ শ্বাস ফেলেন। হেনরী রাসেল দুঃখ করে বলেন, 'যে মেয়ে আমাদের সমাজে আমাদের দেশে মাথার মণি হয়ে থাকতে পারত, হায় তার এই দশা !'

সেবার আঠারোশ খ্রীষ্টাব্দ। কলকাতায় শীত চলে গেল। মাঘ গড়িয়ে এলো ফাল্গুন। আমের মুকুলের গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে

কলকাতার বাতাস। পলাশে শিমুলে লাগল আগুন। সাহেব পাড়ার ঘরে ঘরে খবর ছড়িয়ে গেল যে রোজ বাঁচে কী না বাঁচে! তার ভীষণ অসুখ!

না, বাঁচল না রোজ। সব পাপড়ি মেলে ধরার আগেই গোলাপ গেল শুকিয়ে। ঝড়ে পড়ল মাটিতে। সেদিনের তারিখ দোসরা মার্চ, আঠারোশ খ্রীষ্টাব্দ। উনিশটি বসন্ত যাকে লাবণ্যমণ্ডিত করেছিল তিল তিল করে, কুড়ি নম্বর বসন্ত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল পৃথিবী থেকে।

দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হল ঐ ঝড়ে-পড়া মানবী গোলাপকে। শায়িত করা হল তাকে চিরনিদ্রিতদের মাঝখানে, আরো কিছুদিন পরে তৈরী হল সমাধি। লাগিয়ে দেওয়া হল কয়েকটি গোলাপ গাছ; আর কালো পাথরের ওপর লিখে দেওয়া হল একটি সমাধি-লিপি। এ লিপিতে রোজের দুর্ভাগ্যের কথা গোপন রইল না—

What was her fate ? Long long before her hour
Death called her tender soul by break of bliss,
From the first blossoms to the buds of joy,
Those few our noxious fate unblasted leaves
In this inclement clime of human life.

'ক্যালকাটা গেজেটে'র পাতাতেও এই দুঃখজনক মৃত্যুর বিবরণ প্রকাশিত হল। এখানে কোনো কথাই অনুক্ত রইল না। তারা লিখল, মাধুর্য ক্ষরিত হত যার আচরণে, যার স্পর্শে জীবন উজ্জীবিত হয়—সুখী হয়, আত্মীয়দের দ্বারা নির্ব্বাসিত হয়ে আর যে সমাজের সে উজ্জ্বল অলঙ্কারস্বরূপ—তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে অনারেবল মিস্ এ্যালমার বিকশিত যৌবনের স্ফুটনের মুখে মেসোমশাই হেনরী রাসেলের কুঠিতে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছেন।

মোটকথা, রোজ এ্যালমারের করুণ মৃত্যুতে সাহেব টোলার ঘরে ঘরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। রাসেল পরিবারে নেমে এলো শোকের ছায়া।

আর ওদিকে? সুদূর ইংলণ্ডে? রোজের মা মিসেস্ প্রাইস কতখানি কান্নাকাটি করেছিলেন, কে জানে? তবে ওয়ালটারের কাছে যখন গিয়ে এ সংবাদ পৌঁছুল, তখন তার অবস্থা হল সব থেকে শোচনীয়। সব থেকে করুণ। মনে হল, পৃথিবীর সব আলো নিভে গেছে, সব বাতাস হারিয়ে গেছে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, 'হোয়েন দি নিউজ অব হার ডেথ রিচ্‌ড ল্যাণ্ডর, হিজ থট্‌স্, উই আর টোল্ড, অয়ার 'ফর ডেজ অ্যাণ্ড নাইট্‌স এনটায়ারলি পজেসড্' বাই ইট।' অর্থাৎ ওয়ালটারের চিন্তা ভাবনা আচ্ছন্ন করে রইল এই শোক। এবং এই শোকে কেটে যায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তারপর ঐ শোক থেকেই জন্ম নিল ল্যাণ্ডরের বিখ্যাত এলিজি—'রোজ এ্যালমার।' প্রথমে একটি খসড়া করলেন। সেই খসড়া থেকে কাটাকুটি করে দাঁড় করলেন শেষ পাঠ। এটি ল্যাণ্ডরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। মণিকরেরা যেমন মণি কুঁদে অথবা হাতির দাঁত কুঁদে তৈরী করে অলঙ্কার, ল্যাণ্ডর তেমনি এই মহামূল্যবান কবিতাটি তৈরী করলেন শব্দ দিয়ে কুঁদে কুঁদে।—'কার্‌ভড্ অ্যাজ ইট অয়ার ইন্ আইভরি অর ইন্ জেম্‌স্।'

কবি লিখলেন, পৃথিবীর যা কিছু স্বর্গীয়, যা কিছু সুন্দর—রোজ এ্যালমার, সবই তুমি। আরো বললেন কবি,—'আমার এই জাগ্রত আঁখি, রোজ এ্যালমার, তোমার জন্য কাঁদবে, কিন্তু কোনোদিনই আর তোমাকে দেখতে পাবে না। স্মৃতিভারে ও শোকভারে ভারাক্রান্ত রাত আমি উৎসর্গ করে দিচ্ছি তোমার উদ্দেশ্যে—

Rose Aylmer, whom these wakeful eyes
May weep, but never see
A nignt of memories and of sighs
I consecrate to thee.

কেবল হৃদয়ের তাপেই কবিতাটি অসাধারণ হয়ে ওঠেনি, শিল্পের বিচারেও এটি অনন্য। কবিতার ভাষা সহজ-সরল, অনাড়ম্বর, আবার নির্ম্মলও—'অ্যাণ্ড অ্যাট দি সেম টাইম হন্‌টিংলি মেলোডিয়াস্।' অর্থাৎ আদর্শ এলিজি যা হওয়া উচিত এ কবিতাটি তাই।

চার্লস্ ল্যামের মনে এ কবিতা গভীর ছাপ ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাম চিঠি লিখেছিলেন কবি ল্যাণ্ডরকে—'অনেক কথাই তোমাকে আমার বলার ছিল। অবশ্য এখনই সে সব কথা বলবার সময় নয়। কিন্তু একটা না বলে পারি কই—'রোজ এ্যলমারের' যে যাতু ও মাধুর্য, তার যেন ব্যাখ্যা চলে না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি এ কবিতাটিতেই ডুবে রয়েছি—আই লিভড্ আপন ইট ফর উইক্‌স।'

না, ল্যামের এ উক্তি অতিশয়োক্তি নয়। ক্রাব্ রবিনসন নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন এর সাক্ষী। রবিনসন ছিলেন ওয়ালটারেরও পরিচিত। একটি চিঠি লিখে ল্যামের অবস্থা তিনি জানিয়েছিলেন ওয়ালটারকে। লিখেছিলেন, 'আই হ্যাভ জাস্‌ট সিন্ চার্লস্ অ্যাণ্ড মেরী ল্যাম লিভিং ইন্ অ্যাবসোলিউট সলিচিউড অ্যাট এন্‌ফিল্‌ড। আই ফাউণ্ড ইওর পোয়েমস্ লাইং ওপেন বিফোর ল্যাম…হি ইজ এভার মাটারিং রোজ এ্যলমার'—

রোজ এ্যলমারের প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হওয়া উচিত।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই, শেষ হয়েও সে যেন শেষ হতে চায় না। রোজের অকাল মৃত্যু বিধাতার অভিশাপ হয়ে নেমে আসে কবি ওয়ালটার স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের জীবনে। ওয়েলসের সমুদ্রতীর এবং সোয়ান-শীর স্মৃতি বারবার বিষণ্ণ করে তাঁকে। নানান ছোট ছোট ঘটনা থেকে থেকে মনে পড়ে। মনে পড়ে যায়, রোজের সুন্দর মুখশ্রী।

ওয়ালটারের জীবনে আর্থিক অনটন ছিল না। মায়ের তরফে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্লামারগানশায়ারে এক বিরাট এস্টেট্

পেয়েছিলেন। অনেক টাকা ছিল তার আয়। কিন্তু হঠাৎ মামলা-মোকদ্দমায় সে সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে গেল। বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু পরিবার পরিজনদের সঙ্গে মতে মিলল না। তাই রাগে ক্ষোভে তিনি একাই গিয়ে থাকলেন বাথে। এই বাথে তিনি জীবনের কুড়িটি বছর কাটিয়েছেন একা একা। এখানেও আবার ঝঞ্ঝাট বেধে গেল, তাই পালিয়ে এলেন ইটালীতে, ফ্লোরেন্স সহরে।

ওয়ালটার ল্যাণ্ডরের শেষ জীবন এই সহর ফ্লোরেন্সেই কেটেছিল।

নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন। নির্বাসনও বলা চলে। নিঃসঙ্গ জীবনে কবি নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা অভ্যাস করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি অনেক কাল্পনিক চরিত্র আনতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। অবশ্য কবি এই আলাপের অভ্যাসটি চর্চা করেছিলেন রোজের মৃত্যুর কিছু পর থেকেই। আঠারোশ চব্বিশ থেকে ছেচল্লিশের ভেতর তিনি কয়েকটি কাল্পনিক সংলাপের কাহিনীও লিখেছিলেন। এতে কত বৈচিত্র্যই না রয়েছে লুকিয়ে! কখনো দেখা যায় স্বয়ং ঈশপ কথা বলছেন মিশরের একটি শ্লেভগার্লের সঙ্গে, কখনো বা অষ্টম হেনরী অ্যানিবোলিনের সঙ্গে। বেকন বলছেন স্পেনসারের সঙ্গে, হেলেন সম্ভাষণ করছেন অ্যাকিলিসকে। দান্তে বিয়াত্রিচের সংলাপও বাদ পড়ে নি ওয়ালটারের কল্পনা থেকে।

এই সব কাল্পনিক সংলাপ লিখতে লিখতে রোজের সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা মনে মনে চলত কী!—নিশ্চয় চলত। নিশ্চয় মনে পড়ত কলকাতার কথা। সুদূর ফ্লোরেন্স থেকে তাঁর কল্পনাকে তিনি পাঠিয়ে দিতেন বাঙ্‌লাদেশের কলকাতায়। সেই কলকাতা, যেখানে কোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কল্লোলিত গঙ্গানদী। যেখানকার কবরখানায় গোলাপ ঝড়িয়ে দিয়েছে তার পাপড়িগুলি!—'হয়ার গ্যাঞ্জেস্ রোলস্ হিজ ওয়াইডেসট্ ওয়েভ, শি ড্রপড হার ব্লসম্ ইন্ দি গ্রেভ।'

শেষ জীবনে আর্থিক অনটনে পড়লেন ওয়ালটার। সে দায় থেকে তাঁর সন্তান সন্ততিরা কিন্তু উদ্ধার করতে এলো না। বরং দূরে সরে রইল। সেদিন কবি ব্রাউনিং এগিয়ে এলেন ওয়ালটারকে সাহায্য করতে। ঐ সাহায্যের জন্যই ল্যাণ্ডরের শেষ কদিন নির্বিঘ্ন হল। দুবেলা দুমুঠো খেতে পেলেন।

এরপর একদিন নেমে এলো সন্ধ্যা। রোজ এ্যালমারের মৃত্যুর চৌষট্টি বছর পরে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে নিঃসঙ্গ নির্জনতায় ফ্লোরেন্সে চোখ বুজলেন ওয়ালটার। —একটি প্রেম, দুটি হৃদয়। একটি পড়ে রইল ইটালীতে, আরেকটি কলকাতায়। বিধাতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

দুজনেরই এক কপাল। স্বদেশকে ভালবেসেও কেউ ফিরে যেতে পারলেন না স্বদেশে। ঘরে ফেরার দিন এঁদের কারোর কাছেই এলো না। দুটি হৃদয় একটি প্রেমে জোড়া লাগা ত দূরের কথা!

চার

সহর কলকাতার প্রথম নায়িকা

কলকাতা মানেই দুশো মজা। আর সে কলকাতা যদি পুরনো দিনের হয়, তবে ত কথাই নেই! সেখানে নিত্যি নতুন কাহিনী। নিত্যি খবর। এক কাহিনী ফুরতে-না-ফুরতে আরেক কাহিনীর উদয় হয়। জীবনের মঞ্চের সঙ্গে এক হয়ে যায় রঙ্গমঞ্চ।

সেবার আঠারো শতকের শেষ! উনিশ শতক অবশ্য তখনো দূরে! ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু সে শাসনের পুরোপুরি মহিমা বিকশিত হয়ে ওঠেনি। তাই কলকাতায় নিত্যি মজা। নিত্যি সংবাদ। নানারকম নাটকীয় ও রোমহর্ষক ঘটনা আকাশে বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ খবর রটলো—ওয়ারেণ হেসটিংস্ লাটসাহেব হয়েছেন। কাশিমবাজারে কান্তমুদীর বাড়িতে যে রাঙা-মুখ সাহেব পান্তাভাত খেয়ে লাঞ্চ সেরেছিলেন, তিনি হয়েছেন লাটসাহেব। বার্ষিক বেতন, নগদ আড়াই লাখ টাকা। হাওয়ার মুখে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা সহরে। বিস্ময়ে কারো কারো চোখ উঠল কপালে।—আর এ বিস্ময় ফুরতে-না-ফুরতে চাঁদপালঘাট উচ্চকিত হয়ে উঠল তোপের আওয়াজে! একটি নয়, দুটি নয়, গুপুস গুপুস করে সতেরোটি তোপ পড়ল! সকলেরই চোখেমুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল জিজ্ঞাসা, কী ব্যাপার? এ আবার কী?—উত্তরও পাওয়া গেল। লাটসাহেব এসেছেন। এবার এলেন তাঁর সভার সদস্যেরা। আসছেন বিলেত থেকে। তাঁদের জন্য এ অভ্যর্থনা। ক্লেভারিং-মনসনফ্রানসিস

কলকাতার মাটিতে সেই পা দিলেন! লাখ টাকা করে ওঁদের বার্ষিক মাইনে!

এই রকম করে নিত্যি নতুন খবর! মেয়র্স কোর্ট বলে সেকালে ছোট্ট একটি আদালত ছিল! সে আদালতে কুলোল না। পরিবর্তে তৈরী হল সুপ্রীম কোর্ট। সেখানে প্রধান বিচারপতি হয়ে যিনি এলেন, তিনিও কারোর থেকে কম না। তাঁর নাম এলিজা ইম্পে। আশি হাজার টাকা তাঁর বার্ষিক বেতন! এর পরে হল নন্দকুমারের ফাঁসী। এ ফাঁসীর ব্যাপারে চারদিকে ছি-ছিক্কার পড়ে গেল। সাদা কালো উভয় কলকাতাই ধিক্কার দিল হেসটিংস্‌কে। এর ভেতর লাটসাহেবকে নিয়ে এক চাপা কেচ্ছাও শোনা গিয়েছিল। না, লাটসাহেব বলে কেউ রেয়াৎ করেনি তাঁকে। এক চিত্রকরের স্ত্রীর সঙ্গে গোপন প্রেম। অমন মুখরোচক খবরটি অনেকদিনই লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। পরে কেচ্ছা নয়, সত্যি সত্যি একটা নাটক ঘটে গেল। তবে এ কেচ্ছার নায়ক লাটসাহেব নন, তাঁর একজন প্রধান পারিষদ। সহর কলকাতার সব থেকে রহিস ব্যক্তি।

মিস্টার গ্র্যাণ্ড নামে এক সাহেব ছিলেন সেকালের কলকাতায়। আর তাঁর ছিল এক পরমাসুন্দরী স্ত্রী। ঐ সুন্দরী স্ত্রী থাকার জন্য অনেকেই খাতির করতেন তাঁকে। লাটসভার সদস্য বারওয়েল পর্যন্ত বোধ হয় এ কারণে গ্র্যাণ্ড সাহেবের বন্ধু ছিলেন। একদিন রাত্তিরবেলা মিঃ গ্র্যাণ্ড বারওয়েল সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন সাপার খেতে। হ্যাঁ, এরকম তিনি মাঝে মাঝেই যেতেন। সে রাতে টেবিলে বসে সবে হয়ত স্যুপে চুমুক দিয়েছেন, এমন সময় গ্র্যাণ্ডের চাকর এসে হাঁফাতে হাঁফাতে খবর দিল যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। মেমসাহেবের ঘরে ধরা পড়েছে এক নাগর।—এ হেন সংবাদে কোন্ পুরুষ না বিচলিত হয়?—সাহেবও হলেন। তবে একা বাড়ির দিকে গেলেন না। লাটসাহেবের খোদ কোটাল মেজর

উইলিঅম পামারকে একডেলা দিয়ে সঙ্গে নিলেন। চোর ধরার জন্য পামার সাহেব হাতে নিলেন একটি তলোয়ার কিন্তু বাড়ি পৌঁছনর পর সকলের চোখ উঠল কপালে। মই দিয়ে উঠে দেয়াল টপকে যে নাগরটি মেমসাহেবের কুঠিতে ধরা পড়েছেন, তিনি আর কেউ নন, ফিলিপ ফ্রান্সিস। কিছুদিন আগে যাঁর অভ্যর্থনায় চাঁদপাল ঘাটে তোপ পড়েছিল, ইনিই সেই সাহেব। সুপ্রিম কাউন্সিলের ছুঁদে মেমবার। তবে দুঃখ এই, পামার সাহেবের তলোয়ার তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানাতে পারল না ; কেননা তার আগেই সাহেব গা ঢাকা দিতে পেরেছেন।

মোট কথা, এরকম একেকটি রোমহর্ষক ঘটনায় সহর কলকাতা যখন হয়ে উঠছিল উদ্বেলিত, এবং লাট সাহেবরা পর্যন্ত যখন এ হেন প্রমোদে গা ঢেলে দিয়েছিলেন, সে সময় সত্যি সত্যিই এক যথার্থ তরুণী নায়িকার আবির্ভাব ঘটল কলকাতায়। শ্রীমতী গ্র্যাণ্ডের কথা আগেই বলেছি, এ নায়িকা তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলেন। গ্র্যাণ্ড রূপসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বেওয়ারিশ ছিলেন না। পরঘরনী থাকার জন্য বেপরোয়া হতে তাঁর একটু বাধা ছিল! এ নতুন নায়িকার বেলায় এ সব বাধা থাকল না। ইনি ছিলেন বেওয়ারিশ ও বেপরোয়া। মাদাম গ্র্যাণ্ড ছিলেন চন্দননগরের মেয়ে। এ নায়িকা চুঁচুড়ার। কলকাতায় যেমনি পা দিলেন, অমনি হয়ে পড়লেন মক্ষিরানী। মুহূর্তে তৈরী হয়ে গেল মধুচক্র। নবমধুলোভী মধুকরদের গুঞ্জনে অকাল বসন্ত এলো কলকাতায়। আর সেই অকাল বসন্ত নিত্য বসন্ত হয়ে মক্ষিরানীকে ঘিরে রইল।

সেকালে কলকাতায় এক পাগলা সাহেব ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হিকি। সতেরোশ সত্তর সাল। শীতকাল। জানুয়ারী মাসের উনত্রিশ তারিখ। এক শনিবার। পাগলা হিকি কাগজ বের করলেন একটি। কাগজের নাম, 'বেঙ্গল গেজেট।' সহর কলকাতার ইতিহাসে সেই প্রথম খবরের কাগজ। লণ্ডন টাইমস

পর্যন্ত তখনো বেরোয়নি। এর পাকা আট বছর পরে ঐ কাগজখানি বেরোয়। সে হেন সময়ে 'বেঙ্গল গেজেট' বেরল। সপ্তাহে সপ্তাহে বেরোত কাগজটি। দুটি করে পাতা থাকত। বারো বাই আট ইঞ্চি—এই ছিল কাগজের আকার। উভয় পৃষ্ঠাতেই ছাপা থাকত তিন কলম। তবে খবরের থেকে অর্ধেক থাকত বিজ্ঞাপন। এ পত্রিকা যখন বেরোয় তখন না ছিল সাংবাদিক রাখার নিয়ম, না ছিল টেলিফোন-টেলিপ্রিনটার। সাহেব নিজে যেমন যেমন খবর জোগাড় করতে পারতেন, সে রকম ছাপতেন। তা যদি রসাল কেচ্ছার খবর হয়, তবে ত কথাই নেই। পাগলা হিকি নানারকম রসাল নামকরণ করে রসের হাট বসাতেন। তাতে লাট সাহেবের প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি তা বাদ দিতেন না।

দেশে থাকার সময় হিকি কাজ করতেন মুদ্রাকরের। এদেশে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। ব্যবসা করতে। ব্যবসা করলেন। জমল না। উল্টে অনেক ধার দেনা হয়ে গেল। আর সে ধার শোধ করতে না পারার দরুণ জেলে যেতে হল। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর কি করেন? বের করলেন ঐ পত্রিকা। অনেকেরই ওপর ছিল তাঁর রাগ। একে একে ঐ সুযোগে সকলকেই নিলেন এক হাত করে। নতুন লাটসাহেব হেসটিংসকেও ছেড়ে দিলেন না। বরং তাঁর ওপর বড়োই তীব্র কটাক্ষ বর্ষিত হতে থাকল। তাঁকে কখনো বানালেন,—'মুঘল'। কখনো বললেন—'রং হেড গ্র্যাণ্ড টার্ক!' ইম্পেকেও নতুন নামে ডাকতে থাকলেন—'জাজ জেফ্রেজ।' ইম্পের নাকি ঠিকেদারী ব্যবসা ছিল। তাই ঐ সূত্রে আরেকটি নাম পেলেন—'পুল বাণ্ডি।'—মোটকথা, হিকি ছিলেন নামকরণে সিদ্ধহস্ত। পাঁচজনকে নানা নামে ডাকতেন। তবে নিজেকে সর্বদাই পরিচয় দিতেন—'দি ট্রু্ বরন্ ইংলিশম্যান' বলে।

ঐ সহর চুঁচুড়ার মেয়েটির নাম ছিল এমিলিয়া র‍্যাংহাম। আদরে এম্‌মা। সংক্ষেপে এমা। এমার বাবা ছিলেন উইলিঅম।

একদা তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলেন এই বাঙলা দেশে। তাঁর আরেকটি মেয়ে- ছিল। তাঁর নাম, এলিজাবেথ। সে আরেক নায়িকা। তবে সহর কলকাতার মাথা ঘোরানোর আগেই বাবা উইলিঅম তাকে নিয়ে চলে যান। সম্ভবত সেণ্ট হেলেনায়। যাবার সময় আদরের এম্‌মাকে কেন যে বাঙলা দেশে রেখে গেলেন কে জানে ?

কিশোরী মেয়ে যুবতী হল। তারপরে তার আবির্ভাব ঘটল কলকাতায়। সে সময় কলকাতায় সাড়ে চার হাজারের মত সাহেব ছিল। আর ইউরোপীয়ান মহিলা ছিলেন মাত্র শ' দুই আড়াই। সুতরাং খুব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে সাদা মেয়েদের কী কদর ছিল! এর ওপর ঐ মেয়ে যদি প্রকৃত সুন্দরী হয়, তবে ত কথাই নেই! তাই তরুণী এমার রূপ লাবণ্যের খ্যাতি সাহেব মহল্লায় সাদা মানুষের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত। আর কত যে তৃষিত হৃদয় সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার হিসাব কে রাখে ?

পাগলা হিকি ঐ রোমান্টিক মেয়েটিকে নিয়ে দিনের পর দিন তাঁর কাগজের পাতায় পাতায় নানান রকম নাটকীয় আখ্যান পরিবেষণ করতে থাকলেন। তাঁর পত্রিকায় এই তরুণীর নানা নাম। যেহেতু সে চুঁচুড়ার মেয়ে তাই ফরাসী কায়দায় তার নাম দেওয়া হল —'চিন্‌সুরা বেল'। তার বাবা যেহেতু ছিলেন সেনট হেলেনার লোক, তাই তাকে 'সেন্‌ট হেলেনা ফিলি' বলেও ডাকা হতে থাকল। আর তার প্রণয়ীদের সঙ্গে মিশিয়ে এমন কয়েকটি নাম দেওয়া হল যার অর্থ সেকালের রসজ্ঞ লোকেরাই একমাত্র অনুধাবন করতে পারত। সুন্দরী এমাকে কখনো বলা হত টারবান কংকোয়েসট্', কখনো বা 'হুকা টারবান।'

মক্ষিরানী এমাকে ঘিরে যে সব মধুলোভী মধুকরেরা অবিরল গুঞ্জন করতো, তাঁরা কেউই পাত্র হিসাবে কম ছিলেন না। কম

ছিলেন না বৃত্তি ও পদমর্যাদায়। লিভিয়াস, ডেভিস, মিলটন ও টেলার ছিলেন এঁদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য। তবে বড়ো বড়ো যাঁরা হাঙর-কুমীর, তাঁদেরও নজর এদিকে ছিল। ঐ যুবতীর প্রতি হেস্‌টিংস-ইমপে-ফ্রানসিসের সতৃষ্ণ লোলুপতার কথা কে না জানত!

সেকালের সুখসাগরে ছিল হেসটিংসের অবকাশ-নিবাস। সেখানে গেলেই তাঁর সুখ উথলে উঠত। এমাকে ঘিরে আরেক সুখ তৈরী হল। এখানে চিরবসন্ত। পাগলা হিকি এখানকার সুখের হাটে সকলের গলাতেই ধরিয়ে দিলেন সুর। স্যার এফ রং হেড ওরফে হেসটিংস এ হাটে বসে বলেছিলেন,—'জেনে রাখুন, সংগ্রামেই আমার আনন্দ।' তবে বেদনার বাণী উচ্চারণ করেও লিখেছিলেন: 'হাউ আই অ্যাম ওয়েদার-বিটন অ্যাণ্ড শ্যাটার্ড।' 'পুল বাণ্ডি' ওরফে এলিজা ইম্পে এমার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,— 'গোল্ড ফ্রম ল ক্যান্ টেক দি স্ট্রিং।'

মিলটন নামে যে প্রণয়ীটি এমার সুখের হাটে নিত্য আসতেন, হিকি তাঁর নাম দিয়েছিলেন অনেকগুলি। তবে যে নামটি সব থেকে চালু ছিল, তা হল, 'জ্যাক প্যারাডাইস লস্‌ট।' স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হবার আশঙ্কায় সদাই যেন তাঁর চিত্ত করত দুরু দুরু। অকপটেই তিনি বলতে পেরেছিলেন—'সে নাগরই ধন্য যিনি মোহিনী নারীকে বিবাহ বাঁধনে বাঁধেন।' এ কথাও কবুল করেছিলেন—'টিজ ইমপস্‌বল্ ফর মি, অ্যাজ আই হোপ টু বি সেভড ম্যাডাম।'— অর্থাৎ হে ললনে, তোমার হাতেই আমার মরণ—আমার মরণ। তবে এ মরণে বড়োই জ্বালা।

প্রণয়ী লিভিয়াসের বেশ দু'পয়সা ছিল। ইনি ছিলেন হেস্‌টিংসের দুশমন। আর ফ্রানসিসের দক্ষিণ হস্ত। কেন কে জানে হিকি এঁর নাম দিয়েছিলেন, 'আইডিয়া জর্জ' বা 'টাইটাস'। এঁর সঙ্গে সম্পর্কিত করেই হিকি নায়িকার নাম দিয়েছিলেন—

'টার্বান কংকোয়েস্ট' বা 'হুঁকা টারবান' উনি কাজ করতেন সৈন্য বিভাগে, ভালো মদের ওপর আগ্রহ ছিল তাঁর গভীর। সুরা ও নারীকে নিয়ে একটি অদ্ভুত ককটেল তিনি বানাতে পেরেছিলেন তাঁর আপ্ত বাক্যতে—'ভালো মদ দীর্ঘদিন অস্বাদিত থাকলে, তা ভিনিগার হয়ে যায়।'

'বোর্ড অব ট্রেডে'র পয়লা নম্বর কর্মচারী ছিলেন যে প্রেমিকাটি সেই টেলারকে হিকি দিয়েছিলেন একেবারে বাঙলা নাম। সে নামটি হল টেলার-এর বাঙলা অভিধা। অর্থাৎ দর্জি। কখনো কখনো আদরে বলতেন 'পিগদানী দর্জি।' নায়িকা এমা এঁর 'চিত্তে নিতি নিত্যে তাতা থৈ থৈ' করে নেচে বেড়াতে থাকতেন —ব্যারিস্টার ডেভিসেরও প্রায় একই হাল হল। মিলটন বা লিভিয়াসের মতন সাহেব অতটা চটপটে ছিলেন না। বরং একটু বেশি রকমেই ছিলেন দুর্বল। তাই হিকি তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'কাউনসেলার ফিবল'—অর্থাৎ নিধিরাম সর্দার।

এইসব মধুকরদের নিয়েই মক্ষিরানীর আসর। রানীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তীব্র ওঁদের প্রতিযোগিতা। কার দিকে রানী চোখ তুলে তাকান, এই নিয়ে অধীর প্রতীক্ষা। তাই মক্ষিরানী কার দখলে আসে এ নিয়ে চলল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেকালে ডুয়েল লড়ার খুব রেওয়াজ ছিল। স্বয়ং হেসটিংস্ কাউনসিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রানসিসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছিলেন সামান্য একটু মতান্তরের জন্য। ক্লেভারিং ডুয়েল লড়েছিলেন বারওয়েলের সঙ্গে। তাই তিলোত্তমাকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের যে যুদ্ধ বেধে যাবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে?

কিন্তু শেষবেশ যুদ্ধ হল না। যদিও তা প্রতিটি মুহূর্তে ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল, তবুও না। হঠাৎ শোনা গেল, আইডিয়া জর্জ ওরফে লিভিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমতী বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 'কাউনসেলের ফিবল'-কে অর্থাৎ ব্যারিস্টার ডেভিস-কে। এ

সংবাদে গর্জন করে উঠলেন হয়ত সিভিয়াস। ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি রওনা দিলেন বন্দুক ঘাড়ে করে। কিন্তু গিয়েই যা শুনলেন তাতে দেখা গেল, ঐ অল্প সময়ের ভেতর শ্রীমতীর মতি আবার ঘুরে গেছে। পিগদানী দর্জির সঙ্গে তিনি নাকি চলে গেছেন চুঁচুড়ায়। মকরমুখ প্রমোদতরী তখন গঙ্গার ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে উত্তরে। —অগত্যা শিকারী ও ক্ষিপ্ত লিভিয়াসকে সেদিন ক্ষোভ চেপে রেখে চৌরঙ্গীর জঙ্গলে কয়েকটি কাদাখোঁচা পাখি মেরেই ফিরে আসতে হল।—শ্রীমতীর মন পাওয়া কি অতই সোজা!

হঠাৎ সেকালের গেজেটে ফলাও করে খবর বেরোল—'এ ম্যারেজ ইজ নাউ মাচ টক্‌ড অব বিটুইন্ কাউনসেলার ফিবল অ্যাণ্ড দি চিনসুরা বেল।'

এই রকম নানান মজাদার ঘটনা ঘটত। আর ঐ রসাল ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত উপাদেয় করে দিনের পর দিন ছাপা হত কাগজে। যার দিকে শ্রীমতী তাকাতেন, সে নিজেকে মনে করত আকবর বাদশা। কেউ কেউ উৎফুল্ল হয়ে আবার কবিতাও লিখত। —পিগদানী দর্জির ঘাড়ে সত্যি সত্যিই একদিন 'মিউজ' ভর করল। এমার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে এল সুদীর্ঘ একটি ওড। পালকের কলমে দেখা দিলেন বীণাপাণি—

টু সিং ফেয়ার এম্‌মাজ ন্যাটাল ডে
মাই আমব্‌ল মিউজ ইনস্‌পায়ার।

সেদিনকার অষ্টাদশীকে ঘিরে চারদিকের বসন্ত উঠল নিবিড় হয়ে। মিস র‍্যাংহাম শুধু যে দেখতে সুন্দরী ছিলেন তাই নয়, অসাধারণ ছিল তাঁর নৃত্যপটুতা। সাহেবদের নাচের আসর তিনিই রাখতেন জমিয়ে। চুঁচুড়া-চন্দননগরের ইউরোপীয়ান ক্লাবে তাঁর যে গ্ল্যামার ছিল, সে নাচের মহিমা খুব শীঘ্রই কলকাতাতেও বিকশিত হল। নেটিববাবুদের কানেও সে খবর পৌঁছুল যথা সময়ে।

সাগরপারের নীল নয়নাকে দেখবার জন্য তাঁরাও উঠলেন চঞ্চল হয়ে।

সেকালে নেটিববাবুদের শিরোমণি ছিলেন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতন। রাজা প্রথম ছিলেন অপুত্রক। প্রভূত সম্পত্তি। কে খাবে?—তাই চটপট্ তিনি দত্তক নিয়ে নিলেন। কিন্তু ঐ দত্তক নেওয়ার পরে হঠাৎ সে বছর তার পুত্রলাভ হল! সারা রাজবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কোনো এক অভিনব ও অনাস্বাদিত উৎসব সুখ পাওয়ার জন্য সকলে হয়ে উঠল উন্মুখ।—এদিকে এমার সৌন্দর্য ও নৃত্যপটুতার খ্যাতিতে বাবুমহল তাঁকে এক লহমা দেখার লোভ সামলাতে পারছে না। —সেবার এমার জন্মদিনও আসন্ন। আগস্ট মাস। —শরৎকালের রাত্তির বেলা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে বিরাট নাচের আসর বসল। বিরাট আসর। সেখানে এমা আমন্ত্রিত হলেন।

নবকৃষ্ণের সঙ্গে সাহেবদের দোস্তি ইতিহাস বিশ্রুত। স্বয়ং ক্লাইব সাহেব আসতেন বাবুর বাড়িতে দুর্গাপুজোর আসরে। ওয়ারেণ হেস্টিংস পারসী শিখেছিলেন এঁর কাছে। সাহেবরা দলে দলে এসে প্রসাদ খেয়ে গেছে এ বাড়িতে, কাঁড়ি কাঁড়ি গিলেছে মদ। তাই মধুর গন্ধে তাঁরা যে আবার ঝাঁকে ঝাঁকে আসবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কী! হলোও তাই।

ফলে শারদীয় মহাপূজার আগেই আরেক পুজো হয়ে গেল রাজবাড়িতে। ফরাশ-জাজিমে ঢাকা পড়ল নাচঘর। কাচের ঘেরাটোপে ঘোমটা টানল বাতি। আলোয় মোড়া পড়ল রাজপ্রাসাদ। ঝাড় লণ্ঠনের নয়নলোভা সৌন্দর্যে চারদিক উঠল ঝকমকিয়ে। শ্বেত দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল বহুমূল্য কাচপাত্রে রঙিন পানীয়।

এদিকে নেটিব রাজার কাছ থেকে অভ্যর্থনার নিমন্ত্রণ পেয়ে সুন্দরী এমা সলজ্জ হাসি নিয়ে দৌড়ে এলো লিভিয়াসের কাছে। ক'দিন ধরে লিভিয়াসের মন ভারি ছিল। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত সেদিন শরতের অপরাহ্ণে এমার অকস্মাৎ আবির্ভাব আশা করতে পারেননি তিনি। বসে বসে সেবন করছিলেন তামাকু। হুঁকা বরদার গড়গড়ার নল ধরিয়ে দিয়ে গেছে হাতে। গড়গড়ার গুরু গুরু ডাক শুনতে শুনতে সাহেব নতুন করে শিকারে যাবার কথাই ভাবছিলেন। নাচের আসরে যাওয়ার কথা নয়।

হঠাৎ এমাকে দেখে সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেলেন। এমা তাঁকে নাচের আসরে যাবার নিমন্ত্রণ জানালেন। সাহেব এতে আরো গলে গেলেন। কলকাতার আকাশে নেমে এলো সন্ধ্যা। সে সন্ধ্যায় একটি পালকি করে তাঁরা গিয়ে নামলেন নবকৃষ্ণের শোভাবাজারের বাড়িতে। রাজবাড়ির চারিদিকে কেবল পালকি আর ঘোড়ার গাড়ি। দলে দলে এসেছে হুকাবরদারেরা।—পাঙ্খাওয়ালারা হাওয়া করছে ঘুরে ঘুরে। টানা পাখা নয়, বিরাট বিরাট তালপাতার পাখা নিয়ে সাহেবদের বাতাস করছে। ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে সকলেই করছে আইঢাই।—সম্ভ্রান্ত নেটিববাবুরাও সেদিন আমন্ত্রিত। তাঁরা তখন ভীষণ কৌতূহলী। সকলের মুখেই একটি নাম 'এমা'। সমস্ত উৎসবটাই যেন তাঁকে ঘিরে !

নৈশ আহারের পর ঝমঝম নাচ আরম্ভ হয়ে গেল। এমা নিজে যা নাচে তার থেকে নাচায় আরো বেশি! উত্তেজনার রাত তাড়াতাড়ি যেন কেটে যেতে থাকল। কেবল নাচ আর নাচ। তবে সব থেকে যা জমল তা হল অ্যাপেলো-ডাফনির নাচ! যুগল-নৃত্য। ডুয়েট। অ্যাপেলো সাজলেন লিভিয়াস, ডাফনি—এমা। দর্শকদের মনে হতে থাকল যে গ্রীক পুরাণের নায়ক-নায়িকারা সত্যিসত্যিই নবরূপে নেমে এসেছেন মর্তলোকে। আর লিভিয়াসের মনে হতে থাকল, এমা যেন তার নৃত্য-সঙ্গিনী নয়,—একটি পাখি।

বন্দুকের নল তার দিকে উদ্যত রেখেও ট্রিগারে কিছুতেই আঙুল ছোঁয়াতে পারলেন না।

রাত তিনটেয় নাচের আসর ভাঙল। চাঁদ অস্ত গেছে। এক ঝাঁক আকাশের তারা চলে গেছে। এসেছে আরেক দল। এমার অপরাপর প্রণয়ীদের সেদিন মুখ শুকনো। ব্যারিষ্টার ডেভিস বিষণ্ণ মুখে তাকালেন পিগদানী দর্জির দিকে। পিগদানী দর্জি জ্যাকের দিকে। জ্যাক স্পষ্টতই বুঝতে পারলেন যে তাঁর সুখের স্বর্গ গেল হারিয়ে।—প্যারাডাইস্ ইজ লস্ট্। লিভিয়াস ওরফে টাইটাস-কে সেদিন কিন্তু সাম্রাজ্য জয়ের খুশীতে উদ্ভাসিত দেখা গেল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মর্মাহত দেখে এ সুখ ভরে উঠল কানায় কানায়। বিজয় গর্বে সাহেব এমাকে পালকি করে নিয়ে এলেন চৌরঙ্গী পাড়াতে। পালকি বেহারাদের 'হুমব্রাহো' শব্দে নিশীথের স্তব্ধতা ভেঙ্গে পড়তে থাকল। ইতি উতি ডেকে উঠল শেয়াল। লিভিয়াস খুশি খুশি মুখে যে কথাটি এমাকে বলবেন বলে অনেকবার মনে মনে রেখেছিলেন শানিয়ে, তা কিন্তু বলব-বলব করেও বলতে পারলেন না। পালকি পৌঁছে গেল বাসায়। আর তার একটু পরেই আকাশ ফিকে হয়ে এলো। তোপ পড়ল কেল্লায়। প্রভাতী তোপ।

সুন্দরী এমাকে ঘিরে এইভাবে একটির পর একটি ঘটনা যখন ঘটে চলেছিল, দিন যাচ্ছিল গড়িয়ে, সহর কলকাতার ইতিহাসে তখন অনেক পরিবর্তন ও ওলট-পালট চলছিল। ব্যারন ইমহফের স্ত্রীর সঙ্গে হেসটিংসের যে চাপা কেচ্ছাটি শোনা যাচ্ছিল, তা' আর নিছক কেচ্ছা থাকল না। বিবাহের মহিমা পেল। ওদিকে মাদাম গ্র্যাণ্ডের ঘরে ঢোকার অপরাধে ফিলিপ ফ্রানসিস্ অভিযুক্ত হয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। কড়কড়ে পঞ্চাশ হাজার সিক্কাটাকা জরিমানা দিয়ে সাহেব ছাড়া পেলেন। মনসন সাহেব হঠাৎ একদিন

চোখ বুজলেন। তিতিবিরক্ত হয়ে হেসটিংস্ লাটগিরির পদে ইস্তফা দিয়ে রেহাই পেতে চাইলেন। —ফিলিপ ফ্রানসিস্ তো একদিন বিষণ্ণ চিত্তে দেশেই ফিরে গেলেন।

বছর পাঁচেক আগে জন ব্রিসটো বলে এক সাহেব এসেছিলেন এ দেশে কোমপানির কাজ করতে! কর্মস্থল ছিল, অযোধ্যা। রেসিডেন্টের পদে বহাল ছিলেন। ফ্রানসিসের সঙ্গে তাঁর গভীর দোস্তি ছিল। ফলে, হেস্টিংসের কোপ পড়ল তাঁর ওপর। চাকরিটি গেল। সাহেবের বয়স তখন সাতাশ। রক্ত গরম। মুখ বুজে এ অবিচার সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হল। গোপনে ফ্রানসিসের সঙ্গে অনেক শলাপরামর্শ করে ব্রিস্টো রওনা দিলেন বিলেত। ওখানে কোমপানির বড়ো কর্তাদের সঙ্গে দেখা না করলে হেস্টিংসকে জব্দ করা যায় না। যাবার সময় সাহেব ফ্রানসিসের কাছ থেকে একটি পরিচয় পত্র নিয়ে গেলেন। ঐ পত্রে ব্রিস্টো সম্পর্কে ফ্রানসিস মুক্ত কণ্ঠে লিখলেন, 'ব্রিস্টো ইজ কীন, ইনটেলিজেনট, ওয়েল কনেকটেড, অ্যাণ্ড ডিভোটেড টু মাই ইনটারেসটস।' —বিলেতে ঘোরাঘুরি করে অতি সহজে সাহেব কাজ উদ্ধার করলেন। চাকরি ফিরে পেলেন। সেই রেসিডেন্ট-পদই। কাউন্সিল তাকে লক্ষ্ণৌ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল—এ ব্যাপারগুলি হেস্টিংসের কাছে মোটেই প্রীতিপদ মনে হল না, বরং নানা ছুতোয় চেষ্টা করতে থাকলেন—কি করে সব ব্যাপারটি ভণ্ডুল করে দেওয়া যায়। ব্রিসটো কিন্তু তাঁর দাবীতে অটল! পাওনা গণ্ডা পুরোপুরি না-মিটিয়ে নেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। কর্মস্থলে যাবার জন্য তিনি সদা উদ্যত।—'নাথিং বাট ইন্সটানট পজেসান অব হিজ পোসট উইল স্যাটিস্ফাই হিম।' —ফলে, জোর 'টাগ অব ওয়ার' চলল। একদিকে লাটসাহেব স্বয়ং, অন্যদিকে লড়ুয়ে ব্রিসটো। এ গোলমালে পড়ে ব্রিসটোর কলকাতার উপস্থিতি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল।

এ টালবাহানার মাঝেও ব্রিসটো কিন্তু নিজেকে তৈরী রাখলেন। যে বাড়িটিতে ছিলেন, সেটি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন সেবার সতেরোশ আশি। ডিসেম্বর মাস। কনকনে ঠাণ্ডা বেঙ্গল গেজেটের পাতায় ঐ বাড়িটি ভাড়া দেবার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনে জানানো হল,—'জানবাজারের কাছাকাছি সুন্দর একটি জায়গার ওপর বাড়ি আছে। জন ব্রিস্‌টো এখানে থাকেন। এটি ভাড়া দেওয়া হবে। যাঁরা ভাড়া নিতে চান, সত্বর 'ই, টিরেটার' কাছে আবেদন করুন।'

এ সব যখন ঘটছিল, তার কিছু আগে ইউরোপ ভূখণ্ডে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্রিটেনের একটি যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধ অবশ্য তাড়াতাড়ি মিটে যায় এবং একটি চুক্তিও হয়। ঐ চুক্তির ফলে এখানকার কোনো কোনো জায়গার বদল করার নির্দেশ আসে! সহর চুঁচুড়া ছিল ডাচেদের হাতে! ঠিক হয় যে ডাচেরা ঐ সহরটি ইংরেজদের কাছে হস্তান্তর করবে। কোমপানির ওপর দায়িত্ব পড়ল এ সহরটি বুঝে নেবার। কোমপানি হাতের কাছে পেয়ে গেল বেকার ব্রিস্টোকে। এবং তাঁকেই পাঠান হল প্রতিনিধি করে।

সেকালের চুঁচুড়ার নামডাক ছিল বটে, কিন্তু কেউই তার প্রশংসা করত না। নামী দামী ব্যক্তিরা এখানে পায়ের ধুলো দিতে ভুলতেন না যদিও, কিন্তু প্রশংসা করার বেলায় কি রকম যেন কঞ্জুষ হয়ে যেতেন! স্বয়ং ফিলিপ ফ্রানসিস পর্যন্ত এ অসুখে ভুগেছিলেন। তিনি বাদশার সম্মানে এখানে এসে আদর আপ্যায়ন লুঠেছিলেন, অঢেল খানাপিনা ও আতিথ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রশংসার বদলে ডাইরির পাতায় চুঁচুড়া সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'অ্যাজ ডাল অ্যাজ রটারডাম!'

জন ব্রিস্‌টোর কাছে এর কোনোটিই অজানা নয়। তাই গোমড়া মুখেই তিনি রওনা দিলেন চুঁচুড়া। তবে বজরা চেপে গঙ্গার ওপর দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন উভয় উপকূলের নয়ন ভোলানো সৌন্দর্যে

মগ্ন না হয়ে পারেননি। আর চুঁচুড়াতে গিয়ে পলেস্তারা-ওঠা পুরনো একটি সহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যে রূপসাগরে তলিয়ে যাবেন, তা তিনি কখনও ভাবেননি। কখনো না। না স্বপ্নে, না জাগরণে। —কিন্তু ঐ অভাবিত ঘটনা ঘটল যখন তিনি চুঁচুড়ায় এসে এমার দেখা পেলেন! এক মহাদেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা তিনি অনুভব করলেন মনে মনে। বত্রিশটি বসন্তের স্বপ্ন যেন তার মানসীকে খুঁজে পেল। —এ অভিজ্ঞতার প্রথম ধাক্কায় ব্রিস্টো গেলেন পাথর হয়ে। আর ও'দিকে?

ও'দিকেও কম ওলট-পালট হল না। কলকাতা থেকে দূরে, কৌতূহলী ও উৎসুক চোখের অন্তরালে, ওলন্দাজদের একটি পুরনো ম্যানসনের ভেতর দাঁড়িয়ে কাচপাত্রে পানীয় ঢালতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল এমার। সে এক আশ্চর্য শিহরণ! অসংখ্য মধুকরের গুঞ্জনে যা হয়নি, এক লহমার দৃষ্টি বিনিময়ে তা হয়ে গেল। হঠাৎ অ্যাপোলো যেন এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

কলকাতার লোকেরা এ খবর জানল না। পাগলা হিকি পর্যন্ত না। হিকি সাহেব এমা-চক্রের মধুকরদের নিয়ে এতই বিব্রত ছিলেন যে নতুন তথ্যের জন্য একটুকু ঔৎসুক্য তিনি অবশিষ্ট রাখেননি। উল্টে-পাল্টে একই খবর তিনি পরিবেষণ করছিলেন। বিরাশি সালের বসন্ত সমাগমেও তিনি লিখলেন, 'গত বৃহস্পতিবার সুন্দরী এমা এলিগ্যানট জ্যাক প্যারাডাইস লস্টের সঙ্গে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।' —এ খবর পড়ে সকলের মনেই একটি প্রশ্ন উদ্যত হল, 'তবে কি জ্যাকের সঙ্গেই এমার বিয়েটা পাকাপাকি ভাবে হয়ে গেল?' না, খবরটা যে একেবারেই ভুল, হিকি সাহেবও তা ত্বরায় টের পেয়ে গেলেন। তাই পরের সপ্তাহেই তিনি নিজেকে শুধরে নিলেন। এবং চটপট জানিয়ে দিলেন,—'এ বসন্তে চুঁচুড়ার মেয়েটি চুঁচুড়াতেই আছে।'

সে বসন্তে সহর চুঁচুড়ায় সত্যি সত্যিই অনেক ফুল ফুটল। অনেক। মক্ষিরানী সেই কুসুম শোভিত বসন্তে ব্রিস্টোর দিকেই

হাত বাড়িয়ে দিলেন। বসন্ত শেষে যখন গ্রীষ্ম এলো, তাকে শেষ হতে দেবার আগেই বরমাল্য পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। রানী হলেন স্বয়ম্বরা।

প্রবাসী সাহেবদের সেকালে বিয়ের ব্যাপারে নানারকম হাঙ্গামা ছিল। এ নিয়ে অবশ্য কোনো বাধাই পেতে হল না এঁদের। লাটসাহেবের অনুমতির একটা দরকার ছিল। এসে গেল সে অনুমতি। বেঙ্গল ম্যারেজ রেকর্ডের খাতায় মফস্বলের পাতায় লেখা হল,—'মে ২৭, ১৭৮২ সাল। মাননীয় লাট সাহেবের অনুমতিক্রমে অনারেবল জন কোমপানির সিনিয়র মার্চেন্ট জন ব্রিস্‌টোকে এমিলিয়া র‍্যাংহামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বাঁধা হল।' —তলায় সই করলেন সৈন্য বাহিনীর চ্যাপলেন।

এমা সেদিন উনিশ। ব্রিস্‌টো বত্রিশ। কলকাতায় এ খবর যখন গিয়ে পৌঁচেছিল, তখন কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, কে জানে! জ্যাক-টাইটাসেরা সেদিন কি করেছিলেন, তা অনুমান করা হয়ত কঠিন নয়। গভীর বিষাদে নিশ্চয় তাঁরা ডুবে গিয়েছিলেন। পিগদানী দর্জি হয়ত এই বিরহকে অমর করে রাখার জন্য কবিতা লিখতে বসে গিয়েছিলেন। টাইটাস নিশ্চয় বেরিয়ে গিয়েছিলেন শিকারে। যাঁরা কেবল নির্ভেজাল কৌতূহল নিয়ে এ খেলা দেখছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই কোনো সম্ভাবনা না দেখে তাঁদের উৎসাহ এসেছিল ফুরিয়ে।

এমার জীবনে এরপর থেকে নতুন অধ্যায় শুরু হল।

নববধূকে নিয়ে জন ব্রিস্‌টো রওনা দিলেন লক্ষ্ণৌ। প্রথম কয়েক মাস ভালোই কাটল। তারপর বধূ এমার জীবন অত্যন্ত একঘেয়ে মনে হতে থাকল। কলকাতা প্রবল বেগে টানতে লাগল এমাকে। ব্রিস্‌টোকে তাই ফিরে আসতে হল কলকাতায়। এবারে নববধূর কল্যাণে কলকাতাতেই পাকাপাকি ভাবে বসতে হল তাঁকে। সতেরোশ চুরাশির ভেতর সাহেব বেশ জাঁকিয়েই বসলেন এ সহরে। ফলাও ব্যবসা পাতলেন। বণিক সভার সদস্য হয়ে গেলেন। কোনো

ভালো কাজ এখানে হলেই সাহেবের নিমন্ত্রণ আসে আগে। বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উৎসবে অনেক জ্ঞানীগুণী ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে তাঁকেও দেখা গেল।

এদিকে কিন্তু কাজে মন বসে না গৃহলক্ষ্মীর। মন বসে না কিছুতেই। মক্ষিরানীকে নিয়ে মধু চক্র তৈরী হতে পারে, হতে পারে মধু সঞ্চয়, কিন্তু বধূ করে গৃহকাজে মন বসান বোধহয় কঠিন। ব্রিস্টোর জীবনে সেই ব্যর্থতারই ইংগিত এলো। এ পাখিটিকে সাহেব হঠাৎ নাটকীয় ভাবে ধরে ফেলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু খাঁচায় ধরে রাখার কৌশল তিনি পারেননি আয়ত্ত করতে। সিল্কের সোনালী ফিতে তাই শিথিল হয়ে এলো, প্রতিটি মুহূর্ত শঙ্কায় উঠল ভরে,—এই বুঝি বাঁধন ছিঁড়ে যায়—পাখি উড়ে যায়! অর্থাৎ ভাবখানা এই, 'জয় করে তবু, ভয় কেন তোর যায় না'—

বিদেশী নাগরিকদের কাছে তখন এ কলকাতা ছিল একঘেয়ে—বিবর্ণ। না ছিল রমণীয়, না ছিল বৈচিত্র্যময়ী। আর মহিলাদের কাছে অবসর বিনোদন ছিল সব থেকে একটি কঠিন সমস্যা। নাচ-গান থিয়েটারের তেমন বিস্তৃত পসার ছিল না, যা দেখে একটি গৃহবধূর সময় কাটতে পারে। হলওয়েলের কলকাতায় 'ওলড প্লে হাউস' নামে একটি মঞ্চ চালু হয়েছিল বটে, কিন্তু সেদিন তা অতীতের স্মৃতি মাত্র। পরে নগদ লাখ টাকা খরচ করে একটি মঞ্চ খাড়া করার চেষ্টা হয়। চলেছিলও তা কিছুদিন। এর নাম ছিল, ভেণ্ডু মাস্টারের থিয়েটার। এখানকার অভিনয় ছিল একেবারে বাজে। আর প্রবেশ মূল্য ছিল অত্যন্ত চড়া। একটি বক্সের সিট পেতে হলে দক্ষিণা লাগত একটি করে সোনার মোহর। এমার এ দক্ষিণা বহন করার ক্ষমতা ছিল অবশ্য, গিয়েছিলেনও তিনি বহুবার, কিন্তু প্রতিবারই বেরিয়ে এসেছেন ছটকট করে। ছেলেরা সেকালে অভিনয় করত মেয়েদের ভূমিকায়। সে দৃশ্য বড়োই কটু লাগত এমার। সারা গা রী-রী করত।

একদিন থিয়েটার দেখে এসে হঠাৎ এমার বাসনা হল যে একটি

মেয়েদের থিয়েটার দরকার। একেবারে মেয়েদের প্রাইভেট থিয়েটার।

বায়না ধরলেন স্বামীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আবেদন মঞ্জুর। নতুন থিয়েটার। এখানে তিনি পরিচালিকা, অভিনেত্রী। আবার নায়িকাও। মক্ষিরানী হলেন মঞ্চরানী।

সহর কলকাতার ইতিহাসে এ ঘটনা প্রথম। এবং বোধহয় শেষ। পাকা সাত বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর উননব্বই সালের পয়লা মে ঐ থিয়েটারে নায়িকা হয়ে দেখা দিলেন এমা। ভেণ্ডু মাস্টারের থিয়েটারে যা দেখা যেত, এখানে তার বিপরীত চিত্র দেখা গেল। মেয়েরা এখানে পুরুষ সাজল দাড়ি গোঁফ এঁটে। পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। কাগজে কাগজে ফলাও করে ছাপা হল এ অভিনব বৃত্তান্ত। অভিনয়ের প্রথম রাতে অভিনেত্রী এমা তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলি ভাবেই দর্শকদের কাছে নিবেদন করলেন,—

'আউআর এফর্ট টু নো পাবলিক প্রিটেণ্ড্
হিয়ার ফ্রেণ্ডস অ্যালোন আর সামনড টু অ্যাটেনড।'

অর্থাৎ এ অভিনয় জনসাধারণের কাছে প্রশংসা লুঠ করবার জন্য নয়। কেবল বন্ধু-বান্ধবরাই এখানে আসতে পারেন নিমন্ত্রিত হয়ে। —সেকালের কলকাতায় যে সব ছা-পোষা সাধারণ সাহেব ছিলেন, তাঁরা অভিনয় দেখার এ সুযোগ পাননি নিশ্চয়। তাই তাঁরা জুল জুল করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং খবরের কাগজের পাতায় এর বিবরণ পড়ে কোন রকমে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতেন। আর এ ঘোল বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছিল সেকালের 'ক্যালকাটা গেজেট।'

না, এই থিয়েটার বা অভিনয়ও ধরে রাখতে পারল না এমাকে। পারল না মন ভোলাতে। কয়েক মাস অভিনয় করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এমা। এ খেলা আর যেন তাঁর আর ভালো লাগে না। ভালো লাগে না সখীদের। খেলার ছলেই তিনি একদিন

রানী সেজেছিলেন। মাথায় পরেছিলেন নায়িকার মুকুট। খেলার শখ মিটে গেল, এখন নায়িকার মুকুট নামাতে পারলে বাঁচেন।

এমা এবার ইংলণ্ডে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। মনে হল, ওখানে ফিরে গেলে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবেন। যা সংকল্প, তাই কাজ। পরের বছরের প্রথমেই বিলেত রওনা দিলেন এমা। সহর কলকাতার ইতিহাস থেকে একটি উজ্জ্বল দিন খসে পড়ল। তার প্রথম নায়িকাকে পেয়েও সে ধরে রাখতে পারল না।

মধুকারেরা এপারে পড়ে রইল। মক্ষিরানী উড়ে গেলেন সাগরপারে। জ্যাক-টাইটাসেরা অনেক আগেই তালিয়ে গিয়েছিলেন অন্ধকারে। হতাশায়। এখন সে তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত হল। —জন ব্রিস্‌টো হলেন সে নামের অধিকারী। বেচারি এপারে এই কলকাতাতেই পড়ে রইলেন। কয়েকটি মধুর বসন্ত এসেছিল তাঁর জীবনে এখন ঐ সুখস্মৃতি স্মরণ করেই তাঁকে সান্ত্বনা খুঁজতে হল।

এদিকে কলকাতাতেও একটু একটু করে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। হেসটিংস সাহেব বে-ইজ্জত হয়ে ফিরে গেলেন দেশে। লর্ড কর্নওয়ালিশ এসে বসলেন লাটসাহেবের গদিতে। নেটিব পাড়ায় নতুন যুগ আসার সাড়া পাওয়া গেল! কলকাতার ভেতর জঙ্গল কেটে অনেক নতুন নতুন বাড়ি তৈরী হতে থাকল।

সাগরের ওপার থেকে মাঝে মাঝে চিঠি আসে কলকাতায়। তাতে অনেক নতুন নতুন খবর পাওয়া যায়। খবর পাওয়া যায় হেসটিংস্-ইম্পে-ফ্রানসিসের। ঐসব নানা খবরের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে মক্ষিরানী এমার একটু একটু খবর এসে পৌঁছয়। এমা চিরকালই রানী—সুতরাং তাঁর স্তাবকের অভাব কী? —সাগর-পারের অনুরাগীদের ভেতর প্রথমেই এখানে যাঁর নাম শোনা গেল, তিনি আর কেউ নন, ফিলিপ ফ্রানসিস্। —মাদাম গ্র্যাণ্ডের ঘরে

ধরা পড়েছিলেন যিনি, সেই নাগর। মক্ষিরানীর তিনি নতুন মধুকর।

উঁচু পদের বাধায় এবং হয়ত বা লোক লজ্জার খাতিরে যে মেলামেশা ফ্রানসিস আগে করতে পারেননি, এখন সে সব কিছুই রইল না। রূপমুগ্ধ ফ্রানসিস খুব কাছাকাছি এলেন এমার। এমা র‍্যাংহামের সৌন্দর্য ধাঁধিয়ে দিল তাঁর চিত্ত। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর হৃদয় হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত। এই রোমাঞ্চের খবর এবং টুকরো কথার মালা মাঝে মাঝে সাগরের এপারে তিনি ছুঁড়ে দিতেন চিঠির মাধ্যমে। আর সেই সংবাদে সাহেব পাড়ার কোনো কোনো গৃহে নেমে আসত বিষণ্ণ অন্ধকার।

'মিসেস ব্রিস্‌টোকে কয়েক সপ্তাহ দেখিনি—দেখার সৌভাগ্য হয়নি।' —একটি চিঠিতে লিখলেন ফ্রানসিস্‌। অবশ্য পরের সপ্তাহে আবার লিখে পাঠালেন হঠাৎ দেখার উত্তেজনা ভরা চিঠি। এমা কথা দেন, আর সব সুন্দরীর মত সে কথা ভুলতেও তাঁর দেরী হয় না। এখনই শপথ নেন, পরমুহূর্তেই শপথ ভাঙেন। মুগ্ধ ফ্রানসিস্‌ চিঠিতে লেখেন,—'এভরি ভাউ শি ব্রেক্‌স, ক্রিয়েটস এ নিউ চারম।'

ফিলিপ ফ্রানসিস দাস প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। ছিলেন স্বাধীন-চেতা। কিন্তু নিজের অজান্তে তিনি যে এক সুন্দরী নারীর কাছে দাসখৎ লিখে দিচ্ছেন, তা কি কোনোদিন তলিয়ে দেখেছিলেন? —না।

ফিলিপ একদিন গল্প করছিলেন এমার সঙ্গে। কলকাতার গল্প। হিন্দুদের দেশে কাজ করে যে আনন্দ ও সফলতা পেয়েছিলেন, সে গৌরবে তাঁর চোখ-মুখ ছিল উজ্জ্বল। এই খুশিতে উদ্দীপিত হয়ে ফিলিপ ফ্রানসিস বলেছিলেন তাঁর একটি নতুন সঙ্কল্পের কথা। আর সে সঙ্কল্প হল নিগ্রোদের সেবা।

'এ সদিচ্ছার কারণ?' —জিজ্ঞাসা করেছিলেন এমা।

'দাস প্রথাকে আমি উচ্ছেদ করতে চাই।'

'দাস প্রথা?' কথাটি মৃদু উচ্চারণ করে হেসেছিলেন এমা। গালে একটি টোল পড়েছিল। তারপর দুষ্টু হাসি হেসে বলেছিলেন এমা, 'কত ধরনের দাসত্ব আছে তা কি আপনি জানেন? কত লোক দেখেছি দাস হয়ে থাকতেই ভালবাসে। এই দেখুন না, আমাকে যারা এক লহমার জন্যও দেখে, তারা চিরকালের মত আমার দাস হয়ে যায়। —তাদের কথা কি একেবারের জন্য ভেবেছেন ফ্রানসিস? —এতগুলি কথা এক নিঃশ্বাসে বলে হাল্কা একটি প্রশ্ন এমা এরপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ফিলিপ ফ্রানসিসের দিকে,—'ডোনট্ আই মেক স্লেভ এভরি ম্যান আই মিট?'

প্রথমে হয়ত একটু চমকে উঠেছিলেন ফ্রানসিস। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেন নি। পারেন নি অস্বীকার করতে। বরং এ দাসত্ব আরো নিবিড় হোক এ কামনাই তিনি করেছিলেন মনে মনে। অবসরের অলস মুহূর্তে যখন অনার্ড ম্যাডামের কোন কাজ থাকবে না, আলগা চিন্তা থাকবে ইতস্ততঃ সঞ্চরমান, সেখান থেকে কয়েকটি দণ্ড পল কি কর্তব্যনিষ্ঠ অনুগত ভৃত্য ফিলিপ ফ্রানসিস চুরি করে আনতে পারেন না? সুন্দরীর সোনালী আঙুলগুলি কি খামে ভরে পাঠাবে না একটি চিঠিও?

এই ভাবে ফ্রানসিস্ যখন নব বসন্তে মঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকলেন, কলকাতায় এলো শীত। ভীষণ শীত। রুক্ষ বাতাস রিক্ত হাহাকারে হা-হা করে ফিরতে থাকল। এ শীতে সব থেকে যিনি কাবু হয়ে পড়লেন, তিনি আর কেউ নন—জন ব্রিসটো। বেচারির অর্থ ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, গৃহে ছিল রূপসী বধূ এ শীতে তিনি আবিস্কার করলেন যে তাঁর কিছুই নেই! কয়েক বছর পরে এ কলকাতাতেই হঠাৎ একদিন তিনি চোখ বুজলেন। সেদিন তাঁর বয়স সবে বাহান্ন। নাট্যশালার আলো নিভিয়ে দিয়ে 'গ্রেট বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে' বেচারি গিয়ে একা একাই শুয়ে থাকলেন।

নায়িকা এমা এ খবর পেয়েছিলেন নিশ্চয়। তবে আদৌ দুঃখিত

হয়েছিলেন কি না কে জানে? কলকাতার মধুকরদের হয়ত তাঁর মনেই ছিল না। চুঁচুড়ার স্মৃতি, কলকাতার বসন্ত অথবা হিকির রঙ্গ রসিকতা এ সবই ছিল হয়ত তাঁর কাছে একটি বিস্মৃত স্বপ্নমাত্র! কিন্তু মজার কথা এই, কলকাতার মঞ্চ তার প্রথম নায়িকাকে কিন্তু ভোলেনি। ইতিহাসের একটি পাতায় এই সুন্দরী ও খেয়ালী নায়িকার নাম লিখে রেখেছে সোনার অক্ষরে।

এই 'সোনার অক্ষরে' লেখা কী পরিমানে যে সত্য, তা পরবর্তী কালের ইতিহাস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।—না, স্বনামে নয়, স্বদেহে ত নয়ই, এমা এবার মূর্ত হয়ে উঠলেন পরবর্তী কালের অভিনেত্রীদের ভেতরে। নায়িকা এশথার লিচ্ বা অষ্ট্রেলিয়া থেকে আগতা দেরম্যাভিয়ের মধ্যে দিয়ে অভিনেত্রী এমা আবার নতুন করে জন্ম নিলেন। কলকাতার ইতিহাসে নতুন যুগ এলো। —গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গেল প্রবাহিত হয়ে। গাছে গাছে অনেক পাতা ঝড়ল।···অনেক। অনেক ধূলো উড়ল।

পাঁচ

আগুনের নামে নায়িকার নাম

দুপুর রাত। ঘুম ভেঙে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস। অসহ্য গুমোট। হলেই বা সাহেব, তাঁরাও সে রাতে বাইরে শুয়ে ছিলেন। কেউ বারান্দায়। কেউ ছাতে। গরমে হাঁসফাঁস করছিলেন সকলে। ঘুম যেন আর আসে না! মাঝে মাঝে মশার উৎপাত তো আছেই। শেষকালে সবে যখন একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় কারা যেন চীৎকার করে উঠল, 'ফায়ার-ফায়ার হেলপ-হেলপ!'

সেকালের কলকাতার ঐ 'ফায়ার' কথাটা ছিল সাংঘাতিক আতঙ্কজনক। নেটিবপাড়ার বা নেটিবদের হাটেবাজারে ঐ ফায়ার যে কি প্রলয়কাণ্ড বাধাত, সাহেবদের কাছে মোটেই তা অজানা ছিল না। এক সাহেব একদা রসিকতা করে বলেছিলেন, 'স্বদেশে আমরা অন্তত একটি আনন্দ থেকে বঞ্চিত। আগুনভরা আনন্দ। আগ্নেয় আহ্বানে কখনো তাঁদের সাড়া দিতে হয় না। আর দেখতে হয় না—'ডিসট্রেসিং ক্যালামিটি অ্যাণ্ড অ্যাপালিং ক্রাই—ফায়ার।'

প্রথমে ঐ চীৎকার। তারপর সে ডাকে বেরোনোর পরে চোখের ওপর যা দেখতে হত তা রীতিমত রোমহর্ষ। ছন বা গোল-পাতার ছাউনিতে অথবা দরমার ঘরে ঐ আগুন যে কী রকম প্রমত্ত হয়ে ওঠে, তা না বলাই ভালো। এক আধটা বাড়ি নয়, সারা গ্রাম সেদিন ধ্বংস হয়ে যায়। 'হোল ভিলেজেস্ আর ফ্রিকোয়েনটলি ডেসট্রয়েড ইন এ ফিউ আউআর্স।'

সে আগুন আজ সাহেব পাড়ায়!—তখন রাত একটা। আঠারো শ উনচল্লিশ সাল। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ক্যালেণ্ডারের তারিখ হয়েছে একত্রিশ। সেই গভীর রাতে সাহেবরা দলে দলে নেমে এলেন পথে। তারপর যা দেখলেন তাতে চোখ কপালে উঠল।—তাঁদের সকলের প্রিয় থিয়েটার গৃহটি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

চৌরঙ্গী আর থিয়েটার রোডের মোড়ে সেকালে একটি রঙ্গালয় ছিল। রাস্তার নামে তার নাম ছিল 'চৌরঙ্গী থিয়েটার।' কিন্তু ঐ দ্বিতীয় পথটি রঙ্গালয়ের স্মৃতি বহন করত। সেই থেকে তার নাম —'থিয়েটার রোড।' আঠারো শ তেরো সালে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর একটানা পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে তার গৌরবময় ইতিহাস। না, সহর কলকাতার ইতিহাসে তখনো কোনো থিয়েটারেরই এত দীর্ঘ আয়ু জোটেনি—আজ যেখানে লালবাজার, শোনা যায়, ইংরাজেরা আসার পর সেখানেই তাদের প্রথম রঙ্গালয় তৈরী হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেন, সে সময়েও সে থিয়েটার নাকি বহাল ছিল। আজ যা স্ট্র্যাণ্ড রোড সেদিন তা ছিল না। ছিল কাদামাখা নদীগর্ভ। জোয়ারের সময় জলে ভরে যেত। সে সময় ওখানে নৌকা ভিড়ত। জাহাজও। কে জানে সিরাজ কোন পথে আসেন ? তার ওপর শৌখীন নবাব যদি হঠাৎ সাহেবী থিয়েটার দেখার বায়না ধরেন, তাহলে ?—কলকাতার সাহেবরা তাই নবাবের অভ্যর্থনার জন্য থিয়েটারের মাথায় তোপ সাজিয়ে রাখল। নবাব এলেন। থিয়েটার গৃহটি কেড়ে নিতে তাঁর বেশী সময় লাগেনি। তখন আবার পটপরিবর্তন হল। প্লে-হাউসের মাথায় যে তোপ বসানো ছিল নবাবের সৈন্যেরা তার মুখ ঘুরিয়ে দিল। সাহেবদের কেল্লায় গিয়ে গোলা পড়তে থাকল।

নাঃ, তোপখানায় কী প্লে হয় ? তাই রঙ্গমঞ্চটি ঐ লড়াইয়ের পর উঠে গেল। কারো ইচ্ছা ছিল ঐ বাড়ীতে গীর্জা তৈরী করার। কারো নিলাম ঘরের। শেষ পর্যন্ত ওখানে একটি নিলামঘরই তৈরী হল।

আজ যেখানে 'রাইটারস বিল্ডিং', এরপর, তার পিছনে নাকি একটি প্লে-হাউস গড়ে ওঠে। না, সেটিও টেকেনি। পরে সেখানে তৈরী হয়েছিল বাজার। নতুন চীনা বাজার। অতঃপর লেবেডেফের সেই বহু কথিত নিউ থিয়েটার। নতুন নয়, পুরনো চীনাবাজারের কাছে ডুমতলা পল্লীতে নির্মিত হয়েছিল সেটি, এইভাবে দেখতে দেখতে

ছোট বড় অনেক থিয়েটার তৈরী হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু কোনোটাই টিঁকল না, কাল সহায় নয়, তাই মৃতবৎসা কলকাতা সার্থক থিয়েটারের জন্মদানে ব্যর্থ হল। তবে উনিশ শতকের গোড়াতেই যে সার্থক থিয়েটারটি হল, সেটি হেঁজি পেঁজি নয়, চৌরঙ্গী থিয়েটার। তার গৌরব আলাদা।

আঠারো শতকের কলকাতার সাহেবরা থাকতেন পুরনো কেল্লাকে ঘিরে। আজকের রেল আপিস থেকে জি-পি-ও-এই ছিল সেকালের ফোর্টের সীমা সরহদ্দ। সাহেবরা থাকতেন ক্লাইব রোড থেকে লালবাজার বরাবর। অবশ্য এঁদের কেউ কেউ একটু দূরে থাকতেই ভালোবাসতেন। যেমন, স্বয়ং ক্লাইব থাকতেন দমদমে।—উনিশ শতকের প্রথম থেকে কিন্তু ইংরেজদের এ আস্তানা বদল হতে আরম্ভ হল। চিৎপুর হয়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গল ভেদ করে যে রাস্তা কালীঘাটের দিকে গিয়েছিল পুরনো কলকাতায় তার বেজায় অখ্যাতি ছিল। ঠ্যাঙ্গাড়ে আর ডাকাতদের উৎপাতে তটস্থ থাকতে হত। তবে সব থেকে ছিল বাঘের ভয়। দুপাশে ঘন জঙ্গল। কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে? আর যে সে বাঘ নয়, দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

উনিশ শতকের প্রারম্ভেই সেসব ভয় কাটতে আরম্ভ করল। চৌরঙ্গীর জঙ্গল কাটা পড়ে নতুন পাড়া থাকল তৈরী হতে। সাহেব-পাড়া। তবু দূরে দূরে একটু আধটু জঙ্গল যে একবারে রইল না তা নয়। গ্যাসের আলো তখনো কলকাতায় আসেনি। রাত নামলেই সব আঁধার। চারিদিকে স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতা ভেঙে কখনো কখনো শোনা যায় শেয়ালের ডাক। কখনো বাঘের গর্জন। আর অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর গান রাত্রির নৈঃশব্দকে আরো গভীর করে তুলত।

গরমকালের রাত্তির। ঐরকম শেয়ালের ডাক বা ঝিঁঝিঁর গান শুনতে শুনতেই সম্ভবত ঘুম এসেছিল সাহেবদের। কোনো কোনো প্রবাসী ইংরেজের চোখে বিলেতের স্বপ্ন যে রঙিন মায়ায় দেখা দেয়নি একথা হলফ করে কে বলবে? এহেন সময়ে শোনা গেল,—

'ফায়ার-ফায়ার! হেল্প্-হেল্প্।'

হেল্প্ করার জন্য সকলেই এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু আগুন রোধ করা যায়নি। ফায়ার এঞ্জিন দৌড়ে এসে ছিল, কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি। থিয়েটারের মাথায় যে সুদৃশ্য কাঠের গম্বুজটি ছিল, তার ওপর তখন আগুনের লেলিহান শিখা খেলা করে বেড়াচ্ছে। 'দি উডেন ডোম ব্লেজড ফিয়ারসৃলি, অ্যাণ্ড গ্লেয়ার অব দি কন্‌ফ্ল্যাগারেশন ওয়াজ সীন ইন দি রিমোটেস্ট পার্টস অব দি টাউন।' —অর্থাৎ ঐ ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সহরের বহু দূর থেকেও দেখা যেতে থাকল। আর কাঠের গম্বুজটি জ্বলিতে থাকল দাউ দাউ করে।

রাত আড়াইটে নাগাদ ভেঙে পড়ল সেটি। এবং আর কিছুক্ষণ পরেই সব ছাই হয়ে গেল। একদা কামাগ্নি-রূপাগ্নির অনেক লেলিহ জ্বালা ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। দর্শকদের মনে জ্বালিয়েছিল অনেক আগুন, আজ সেই মঞ্চ নিজেই পুড়ে গেল। পরের দিন কাগজে কাগজে ফলাও করে এসব সংবাদ পরিবেষিত হল।

বিবরণে প্রকাশ, 'পাইলট' ও 'স্লিপিং ড্রাফট্' নামক দুটি নাটিকার মহড়া চলছিল সে রাতে। রাত বারোটা নাগাদ মহড়া সেরে ফিরে এসেছিলেন অভিনেতারা। সাপার খেয়ে খুব নিশ্চিন্ত মনেই তাঁরা বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন। রঙ্গালয়ের সেক্রেটারী যিনি, তিনি ঐ থিয়েটার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে থাকতেন, তিনি হঠাৎ ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পান। এবং তারপর ধীরে ধীরে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সেক্রেটারী এবং যেসব অভিনেত্রী ঐ থিয়েটার গৃহে থাকতেন তাঁদের সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এক টুকরো কাপড়ও তাঁরা বাঁচাতে পারলেন না। সেকালে ইংল্যাণ্ডের 'ড্রুরি' লেন থিয়েটারের অনুকরণে চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান ড্রুরি।' আর দমদমকে বলা হত 'লিট্‌ল ড্রুরি।' ইংল্যাণ্ডের বহুবিখ্যাত থিয়েটারটিও আগুনে পুড়ে যায়। ইণ্ডিয়ান ড্রুরির অদৃষ্টেও অনুরূপ পরিণাম ঘটল।

তখনকার কলকাতায় ইনসিওর করা চালু হয়েছিল, থিয়েটারটি

কিন্তু ইনসিওর করা ছিল না। ফলে সত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি কয়েক ঘণ্টায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিমাশ্চর্যম্! রঙ্গালয় যাওয়া সাহেবদের কাছে কিন্তু ঐ বিপুল টাকার ক্ষতিটা তেমনভাবে নাড়া দিচ্ছিল না। রাতের আকাশ আলো করে যখন লাল আগুনের শিখা নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল, প্রেতের মত কালো ছায়া কাঁপছিল থিয়েটার রোডের বাড়িগুলির গায়ে এবং কবরখানার ওপাশ থেকে যখন শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সকল দর্শক মিলে একজন অভিনেত্রীর কথাই ভাবছিল, সে অভিনেত্রীটি আর কেউ নন, চৌরঙ্গীর সর্বময়কর্ত্রী এশথার লিচ। যাঁকে বাদ দিয়ে ঐ রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত কল্পনা করা যায় না এবং চোখ বুজলেও যাঁর অপূর্ব দেহশ্রী হৃদয়ে আলোড়ন জাগায় সেই এশথারের কথা বেশী করে সকলের মনে পড়ল। একবার নয়, বার বার।

সেকালে ছবি এঁটে রাস্তায় অভিনয়ের পোস্টারিং করা হত না। খবরের কাগজেও ছবি ছাপার কেতা ছিল না। তা সত্ত্বেও কলকাতানিবাসী সাহেবদের ঘরে ঘরে সেদিন এশথারের নাম। ঘরে ঘরে তাঁর ফ্যান। অন্যে পরে কা কথা, সেকালের লাটসাহেব পর্যন্ত তাঁর অনুরাগী।

বিলেতে নয়, এদেশের মাটিতেই সম্ভবত জন্ম হয়েছিল এশথারের। আঠারো শ' নয় কি দশ সালে। জুলাই মাসের ভ্যাপসা গরমে বাঙলাদেশ যখন আইঢাই করছে, সে সময় এ দেশ থেকে বহুদূরে সহর মীরাটে জন্ম হয় তার। বাবার নাম ফ্ল্যাটম্যান। কাজ করতেন সৈন্যবিভাগে। মীরাট ছিল তাঁর কর্মস্থান! এশথারের বয়স যখন সাত, তখন তার পিতৃবিয়োগ হল। অনাথিনী বালিকা তখন আশ্রয় পেল এক সৈনিক কর্মীর কাছে। গাজিপুরের সৈনিক বিদ্যালয়ে তার লেখাপড়ার হাতে খড়ি। লেখাপড়ায় ভালোই ছিল ছোট্ট মেয়েটি। কেননা, এরজন্য সে একটি মেডেলও পেয়েছিল। আর যার তার হাতে নয়, বড়লাট গৃহিণী 'কাউনটেস অব

লাউডেন' স্বয়ং তার হাতে ঐ পদক তুলে দিয়েছিলেন।

বিধাতা পুরুষ পরিচালক হিসাবে তাঁর নাটক কীভাবে অভিনয় করান, কে জানে? তাই শিশু এশথার একদিন গড়াতে গড়াতে এসে হাজির হল এই বাঙলাদেশে। কলকাতায় নয় কিন্তু। রাজধানী থেকে কিছু দূরে। বহরমপুরে।

মুর্শিদাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার উপর ঐ ছোট্ট সহরটিতে তার শৈশব কাটল। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরে ঐ সহরটিতে একটি সামরিক ছাউনি তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয় ইংরাজেরা। কাশিমবাজারের কুঠি সেদিন ছিল না। কেন না, আগেভাগেই সিরাজ সেটি নষ্ট করে দিয়েছিলেন! সতেরো শ' তেষট্টিতে মীরকাশেমের বিদ্রোহ। বহরমপুর সম্পর্কে প্রথমে সাহেবদের একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু উক্ত ঘটনায় সে দ্বিধা কেটে যায়। নগদ তিরিশ লক্ষ তেইশ হাজার টাকা খরচ করে চার বছরের ভেতর ব্যারাক তৈরী হয়। বহরমপুরের সামরিক গুরুত্ব রাতারাতি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই উনিশ শতকের গোড়ায় ঐ ছোট্ট সহরটি জমজমাট।

এখানে প্যাডি ফ্লিন নামে এক করপোরাল এশথারের লেখাপড়ার ভার নিয়েছিলেন। সাহেব নিতান্তই সাদামাঠা ছিলেন। কোনো অসাধারণ প্রতিভাকে উপযুক্তভাবে তৈরী করার মতন তাঁর সামর্থ ছিল না। তবু 'ফোর রুল্‌স অব ম্যাথমেটিকস' অথবা 'অর্থোগ্রাফি-ক্যালিগ্রাফি'-তে এশথারকে পাকা করে তুলেছিলেন।

এই বাহ্য। সেকালে যেখানেই সামরিক ছাউনী থাকত, একটি করে ছোট রঙ্গালয়ও সেখানে গড়ে উঠত। তা ছাড়া ছাউনীর ভেতরে অবসর বিনোদনের জন্য সৈনিকরা নিজেরাও অনেক সময় অভিনয় করত। পরিবার-পরিজনের ছেলেমেয়েরাও সে অনুষ্ঠানে অংশ নিত। এরকম এক অভিনয়ে শিশু এশথার অংশ নিয়ে বসল। টম থাম্বের ভূমিকা। সেই প্রথম। প্রথমেই মাত। যেসব মহিলা দর্শক হিসাবে সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তারা খুশি হয়ে একটি পুরস্কার

দিয়ে বললেন এশথারকে। পুরস্কার হল, সেকসপীয়রের গ্রন্থাবলী। ঐ ছোট্ট মেয়েটি সেকসপীয়ার কি বুঝবে? তাই ঐ সঙ্গে একটি প্লাম কেকও দেওয়া হল।

বহরমপুর রেজিমেনট-এ সেকালে যে সাহেব ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনি কিন্তু মোটেই নাটুকে ছিলেন না। বরং উল্টো। ওসব মেয়েলিপনা তিনি মোটেই বরদাস্ত করতেন না। আর মেয়েদের দিয়ে অভিনয়? —নৈব নৈব চ। এশথার সেদিন নিতান্ত বালিকা, তাই অনেক ভেবেছিলেন, সাহেব এটিকে হয়ত তেমন দূষণীয় মনে করবেন না। কিন্তু এ বৃত্তান্ত যখন তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুল, দেখা গেল, শোনামাত্র সাহেব রাগে ফেটে পড়লেন। তার ওপর পুরস্কার?

দুশ্চিন্তায় বহরমপুর ছাউনিতে সে রাতে কারও ঘুম হল না। না সাহেবের। না আবাসিকদের। ছোট্ট মেয়ে এশথারকে রাতারাতি পালিয়ে বাঁচতে হল।

এশথার পালিয়ে এলো তার ভগ্নিপতির কাছে। এখানে আসার পর তার অভিনয় করার সুযোগ হল অবারিত। একটি একটি করে অনেকগুলিতে সে অভিনয় করল। বালিকা এশথার দেখতে দেখতে হয়ে উঠল তন্বী কিশোরী।

যখন কিশোরী দ্বাদশী, দুম করে একদিন তার বিয়ে হয়ে গেল। কনের চেয়ে বর পাক্কা সতের বছরের বড়ো। কনে বারো। বর উনত্রিশ। নাম, জন লিচ। জন তখন নন-কমিশনড অফিসার। ছোট্ট একটি ছেলে রেখে বৌ মারা গেছে। সেই বিপত্নীক জনের সঙ্গে এশথারের হল বিয়ে। বহরমপুর সাহেবের কর্মস্থল। সেখানকার ছাউনীতে এশথার এবার এলেন বধূরূপে। তবে ছাউনীতে নয়, ওখানকার রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দিলেন তিনি। কিশোরী ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন যুবতী। যুবতী অভিনেত্রীর মনে তখন স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে। তার খ্যাতি নিশ্চয় একদিন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাকে কলকাতা একদিন যেতেই হবে।

ঐ রকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে দিন কাটছিল এশথারের। একটু

একটু করে অভিনয়ের খ্যাতিও পড়েছিল ছড়িয়ে। সহর কলকাতাতেও অনেকের মুখে তাঁর নাম শোনা যাচ্ছিল। এরকম সময় হঠাৎ জন লিচকে রওনা হতে হল রেঙ্গুন। ব্রহ্মদেশে হঠাৎ একটি গোলযোগ বেধে উঠেছে। জন চলে গেলেন। বহরমপুরে একা পড়ে রইলেন এশথার।

সেকালে চৌরঙ্গী থিয়েটারের খুব নাম ডাক ছিল সত্যি কথা, কিন্তু দমদম থিয়েটারেরও আকর্ষণ কম ছিল না। আগেই বলেছি তাকে বলা হত 'লিটল ড্রুরি।

সেই লিটল ড্রুরি থেকে বহরমপুরে এশথারের কাছে এক দূত এসে হাজির। দমদম থিয়েটারে যোগদান করার আহ্বান সে নিয়ে এসেছে। না, এ সুযোগ এশথার ফিরিয়ে দেননি। জন না থাকায় বরং সুবিধাই হয়েছিল। সোজা চলে এলেন দমদমে। প্রতি অভিনয়ের জন্য পারিশ্রমিক রফা হল ষাট টাকা করে। মন্দ কী?

শেরিডানের 'দি রাইভ্যাল্‌স্‌' নাটকটি দিয়ে দমদমে অভিনয় আরম্ভ করলেন এশথার। ভূমিকা লুসির। দূর মফস্বলে এতদিন এশথার যে সাধনা করে এসেছিলেন, তা ব্যর্থ হল না। আশাতীত সফলতা এলো। খুব অল্প দিনের ভেতর সারা কলকাতায় নাম ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে জন লিচ ফিরে এলেন রেঙ্গুন থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোসটেড হলেন দমদমের সামরিক ছাউনীতে। ভালোই হল এশথারের। ঘর থেকে পা বাড়ালেই রঙ্গালয়। মনের সুখে অভিনয় করে চললেন। বিশ তিরিশ রাত পেরোতে না পেরোতেই তাঁর সম্মানে দমদম থিয়েটারের একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করল। সে রাতে জনতায় ভেঙ্গে পড়ল থিয়েটার গৃহ। নগদ দু হাজার টাকার টিকিট বিক্রী হল। আর সবটাই পাওনা হল এশথারের।

কিন্তু যে বিধাতা পুরুষ এশথারের জীবন নাট্য পরিচালনা করে চলেছেন, তিনি তখনও অকৃপণ নন। তাঁর জন্য তিনি আরো ঐশ্বর্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। আরো খ্যাতি।

আঠারো শ' ছাব্বিশ সালের মাঝামাঝি চৌরঙ্গী থেকে ডাক এল

এশথারের। চৌরঙ্গী সেদিন জয়োন্মত্ত। এশথার ষোড়শী। পরিচালক মহলে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা। যেখান থেকে পারেন ভালো জিনিসটি সংগ্রহ করে দর্শকদের পরিবেষণ করেন। স্বয়ং লাটসাহেব পর্যন্ত আসেন অভিনয় দেখতে।

এশথার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে পারলেন না। বাধা অনেক। প্রধান বাধা হল দূরত্ব। দমদম থেকে চৌরঙ্গী যাওয়া সেকালে খুব সহজ ছিল না। আর মেয়েদের পক্ষে নিয়মিত অভিনয়ে যাওয়া ছিল একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক, সেই অসম্ভবও সম্ভব হল। চৌরঙ্গী থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই সে বাধা সম্ভবত দূর করে দিল। কলকাতার কেল্লায় নিয়ে আসা হল জনকে। শুধু বদলি নয়, জনের পদোন্নতিও হল। গ্যারিসনের সারজেনট-মেজর হয়ে এলেন তিনি। ফোর্ট থেকে চৌরঙ্গী এক কদমের পথ। সুতরাং এশথারের খুবই সুবিধা হয়ে গেল।

আঠারো শ' ছাব্বিশ সাল। জুলাই মাসের সাতাশ তারিখ। বিকেল থেকে চৌরঙ্গী আর থিয়েটার রোডের মোড়ে বেজায় ভিড়। কেউ আসছে পালকি করে—'হুমব্রাহো হুমব্রাহো।' কেউ আসছে অশ্বশকট ফীটনে। কেউ ঘোড়ায় চড়ে। আবার কেউ বা পদব্রজে। কী সাংঘাতিক ভীড়। —কারণ? কারণ এশথার লিচ থিয়েটারে সেই প্রথম অভিনয় করবেন। ষোড়শী নায়িকায় সঙ্গে কলকাতার সেই প্রথম দৃষ্টি বিনিময়।

ভালো হয়েছিল অভিনয়। ঐ দেখাকে শুভদৃষ্টিই বলা চলে। সে রাতের অভিনীত নাটকটি ছিল 'স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল।' আঠারো শতকের পয়লা নম্বর নাট্যকার শেরিডানই ছিলেন এর রচয়িতা। এশথারের ছিল লেডি টিজ্‌লের ভূমিকা। অভিনয় দেখে সকলেই খুশি। খবরের কাগজওয়ালারা সোল্লাসে লিখলেন, 'উই রিজয়েস ছাট দে অয়ার নট ডিসাপয়েনটেড।' মধুর বীণাধ্বনির মত এশথারের সুরেলা কণ্ঠস্বর দর্শকদের কানে মধু বর্ষণ করল। আর

তাঁর অশরীরীর মত রূপলাবণ্য এবং সুন্দর দেহবল্লরী দর্শকদের চিত্তকে যে কী পরিমাণে আনন্দ দান করল, তার কথা না তোলাই ভালো। মোট কথা, ষোড়শী এশথারকে দেখে সেদিনকার কলকাতা পাগল হয়ে উঠল।

সেকালে বিলিতি খ্যাতিমানদের নামে এদেশের শিল্পীদের নামকরণের একটা রেওয়াজ ছিল। এশথার যখন খ্যাতির শীর্ষে উঠে গেলেন, তখন কলকাতার দক্ষ থিয়েটার সমালোচকেরা তাঁর নাম দিলেন 'সারা সিডান্‌স।' সারা ছিলেন ব্রিটিশমঞ্চের এক নামকরা অভিনেত্রী। ছিলেন অভিজাত সুন্দরী। যাকে বলে 'তন্বী শ্যামা', সেইরকম। তাঁকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে ছিল থিয়েটারে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বা তার একটু পরে তাঁর জন্ম। এশথার যেদিন চৌরঙ্গী থিয়েটারের পাদপ্রদীপের আলোয় দেখা দিলেন, সেদিন সারা সিডান্‌স বুড়ি থুথ্‌থুরি। সত্তরের মত বয়স। কিন্তু কলকাতার দর্শকদের মনে হল সেই সারা যেন ষোড়শী যুবতী হয়ে তাঁদের মাঝখানে ফিরে এসেছেন।

প্রথম সেই অভিনয়ের দিন থেকে পাকা একটি যুগ এশথার চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনয় করে চললেন। দিনের পর দিন। আর সব কটিতেই তিনি সেরা শিল্পী। 'ওথেলো', 'দি ওয়াইফ', এবং 'হাঞ্চব্যাকে' তাঁর অভিনয় কৌশলেই নাটকের খ্যাতি বিস্তৃত হল। সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত তাঁর নাম পড়ল ছড়িয়ে।

এইভাবে দেখতে দেখতে বারোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল কে জানে? ত্রয়োদশী-চৌরঙ্গী পঁচিশ পার হল। চাঁদপাল ঘাটে কত জাহাজ এলো-গেলো। এশথারের বয়সও বাড়ল। সেই ষোড়শী তরুণীটি তিরিশে ধাক্কা দিলেন, বধূ হলেন জননী। অনেক—অনেক সুখ এলো। দুঃখও অনেক। অ্যালিশ ও জুলিয়া নামে ছিল তাঁর দুটি কন্যা। তারা মায়ের মন ভরিয়ে দিত। একটি মাত্র ছেলে জন বল্টন ফ্রান্সিস্। সেও মাকে খুশিতে রাখবার চেষ্টা করত। জননী

এশথারের মন কিন্তু হু হু করে উঠত একটি মেয়ের বেদনায়। সে ছোট্ট মেয়েটিকে একদিন তিনি শুইয়ে দিয়ে এসেছিলেন পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে এশথার গিয়ে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে আসতেন সেখানে। কপাল বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ত কয়েক ফোঁটা অশ্রু। তাঁর মনে হত, তিনি বেশ নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। বেশ রিক্ত।

আঠারো শ আটত্রিশ সাল। কলকাতার সাহেবপাড়ায় হঠাৎ রটনা শোনা গেল, এশথার বিলেত চলেছেন।—কেন? কেন? সকলের মুখে এক প্রশ্ন। ঐ এক কৌতূহল। জবাবও পাওয়া গেল। রাতের পর রাত অভিনয় করতে করতে স্বাস্থ্যহানি হয়েছে তাঁর। সেই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সাগর পারে যাত্রা। যাবার আগে দর্শকদের কাছে দাঁড়ালেন এসে এশথার। জানুয়ারি মাসের কনকনে ঠাণ্ডা। তবু সে রাতে দর্শকরা ভেঙে পড়ল চৌরঙ্গীতে। এগারো শ দর্শক। পাঁচ হাজার টাকার টিকিট নিমেষে বিক্রি হয়ে গেল। একটিসুন্দর কবিতা পাঠ করে দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এশথার। থিয়েটারের মালিক সেদিনকার টিকিট-বেচা সব টাকাটা তুলে দিলেন তাঁর হাতে।—এশথার খুশি মনে জাহাজে গিয়ে উঠলেন।

কিন্তু যে-বিধাতা পুরুষ নেপথ্য থেকে সমস্ত নাটকটি পরিচালনা করছেন, তিনি সেদিন মৃদু হেসে নাটকের পাতা ওল্টালেন।

কয়েক মাস পরে বর্ষাকালের অপরাহ্ণে একটি জাহাজ এসে চাঁদপাল ঘাটে ভিড়ল। বেশ বনেদী জাহাজ। জাহাজটির নাম, 'জাসটিনী'। একটু আগেই বোধ হয় বৃষ্টি হয়ে গেছে। পূর্ব আকাশে ক্ষীণ ইন্দ্রধনু। দুটি মেয়ের হাত ধরে মাটিতে নেমে এলেন এশথার। তারপরই সেই দুঃসংবাদটি শুনলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারের পুড়ে যাওয়ার খবর। আসবার সময় বলটনকে বিলেতে রেখে এসে-ছিলেন। সেজন্য মনটা এমনিতেই ভারি ছিল। তার ওপর এই দুঃসংবাদ। নাঃ, এশথার নিজেকে যেন আর সোজা রাখতে পারলেন না।

থিয়েটার বাড়ির পোড়া দেয়ালের চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ছিল ঐ বাড়িটির সঙ্গে। ছিল অনেক অতীত। মধুর অতীত। সে সব কথা বার বার মনে এলো। আর বার বার ঝাপসা হয়ে গেলো চোখ দুটো। সেই পোড়া বাড়িটি দেখতে দেখতে নেপথ্য পরিচালক বিধাতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এশথার। সাংঘাতিক জেদ চেপে বসল। মনে হল, বিধাতার ইচ্ছাকে তিনি ব্যর্থ করতে পারবেন। পারবেন নতুন করে থিয়েটার তৈরী করতে।

পারলেন তিনি। স্বয়ং গবর্নর জেনারেল যাঁর অনুরাগী, তাঁর আর অভাব কী? আর মনের বলত আছেই!

পাকাপাকিভাবে থিয়েটার-গৃহ খোলার আগে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করলেন এশথার। পুরনো কলকাতার ওলডকোরট হাউস স্ট্রীট এবং ওয়াটার লু স্ট্রীটের মোড়ে বাড়ি ছিল একটি। পরে সেটি 'এজরা বিলডিং' নামে খ্যাত হয়। সেদিন ঐ বাড়িটির নাম ছিল— 'সেন্ট অ্যানড্রুজ লাইব্রেরী।' ওর মালিক ছিলেন 'মেসার্স ডব্লু থ্যাকার অ্যাণ্ড কোম্পানি।' নিচের তলায় ছিল পুরনো গাড়ির আস্তাবল। যেমনি অন্ধকার, তেমনি স্যাঁতস্যেঁতে। রাতারাতি তার চেহারা বদলে গেল। হঠাৎ সেখানে দেখা গেল একটি ঝকঝকে থিয়েটার গৃহ। মঞ্চে নানান কারুকার্য। নানা ফুলের বাহার। কোথাও জালতির সূক্ষ্ম কাজ। কোথাও বা ঝালর ঝোলানো। দেওয়ালগিরিতে সোনালি ও সবুজ আলো। দর্শকদের আসন শ' চারেক। একটি আস্তাবল যে বেবাক ইন্দ্রপুরীতে রূপান্তরিত হতে পারে, ঐ থিয়েটারে না গেলে কেউ জানতেই পারত না।

ঐ অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটকই অভিনীত হয়েছিল। বেশির ভাগই হাসির নাটক। সদ্য বিলেত প্রত্যাগত এশথার সাগর পারের

হাওয়া আনলেন মঞ্চে। রাতের পর রাত ভরে দিলেন হাসিতে। লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন এমিলি ইডেনও এ অভিনয় দেখিবার লোভ সামলাতে পারেননি। অভিনয় দেখার পর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'না, পাখা ছিল না। লম্বা নিচু ঘরটিতে দু-একটি মাত্র জানালা। বলতে গেলে বেশ গরমই লাগছিল বলতে হয়। কিন্তু অভিনয়টি ছিল সত্যি সত্যি চমৎকার। দি অ্যাকটিং ওয়াজ রিয়েলি এক্সেলেন্ট। 'ওর থেকে ভালো অভিনয় আমি কখনো দেখিনি।...ঐ অত গরম সত্ত্বেও হাসির নাটকটি দেখতে দেখতে সারক্ষণই আমি হাসছিলাম।'

এদিকে অস্থায়ী থিয়েটারে যেমন অভিনয় চলল তেমনি একটি স্থায়ী মঞ্চ তৈরীর জন্য প্রয়াসও চলল ভেতরে ভেতরে। চাঁদা উঠতে থাকল। সেদিন বড়লাট ছিলেন অক্ল্যাণ্ড। হাজার টাকা চাঁদা দিলেন তিনি। প্রিন্স দ্বারকানাথও পাঠিয়ে দিলেন নগদ এক হাজার টাকা। মতিলাল শীল দিলেন পাঁচশ। ঐভাবে দেখতে দেখতে দেখতে এগারো হাজার টাকা উঠে গেল। কিন্তু তাতে কী আর থিয়েটার বাড়ি তৈরী হয়? স্থায়ী মঞ্চ তৈরীতে এশথার ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং মঞ্চ তৈরীর সময় যা টাকা উঠেছিল, তার চেয়ে ঋণ করতে হয়েছিল আরো বেশী। অমন মঞ্চ কলকাতায় কখনো ছিল না। সহর কলকাতায় তা রীতিমত অভিনব।

শুধু মঞ্চে নয়, অভিনবত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল অভিনয়েও। খাস বিলেত থেকে অভিনেত্রীদের আমদানি করা হল। আনতে হল অভিনেতাও। এলেন জেমস্ ব্যারী এবং মিসেস ব্যারী। 'অ্যাডেল্ফি' থিয়েটারের সেই বিখ্যাত নটী মিসেস ডিকল্ও এলেন। এঁর ক্লিওপেট্রা দেখবার জন্য থিয়েটারে লোক ধরত না। এলেন মিস্ কাউলি। ছোটখাটো মাপের মহিলা। দেখতে ভালো ছিলেন না বটে, কিন্তু অভিনয়ে তুখোড়। 'ওলড বেরিয়াল গ্রাউণ্ড' রোডের ধারে

তৈরী হল নতুন থিয়েটার বাড়ি। নাম দেওয়া হল, সাঁ-সুশী। সেই সাঁ সুশীতে কলকাতা আবার নতুন করে জেগে উঠল।

একচল্লিশ সালের নয়ই মার্চ। দ্বারোদ্ঘাটন হল সাঁ-সুশীর। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বড়লাট গিয়ে হাজিরা দিলেন। আরো কতজন যে গেলেন তার ঠিক নেই। জ্ঞানীগুণীর সমাবেশে ভরে উঠল থিয়েটার গৃহ। সে রাতে 'দি ওয়াইফ' বলে একটি নাটক অভিনীত হল। মেরিয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এশথার। ঘন ঘন করতালিতে সকলেই অভিনন্দিত করল তাঁকে।

মহা খুশি এশথার। তাঁর জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা আজ চরিতার্থ হয়েছে। বহরমপুর পেরিয়ে দমদমের সেই ধূসর দিনগুলি অতিক্রম করে তিনি আজ আসতে পেরেছেন সাঁ-সুশীতে। অভিনয় মিশে গেছে তাঁর রক্তে রক্তে। তারই তাড়ায় তিনি পেরিয়ে এসেছেন অন্তহীন পথ। এসেছেন সফলতার শীর্ষে। সুতরাং আজ তাঁর নাগাল পায় কে? কিন্তু কে জানত সে পরিচালক তখনো মাথার ওপর বর্তমান! কখন কাকে কোন্ ভূমিকায় তিনি অভিনয় করান, কে জানে? কার গৌরব কেড়ে নিয়ে কাকে দেন কে বলতে পারে?

হঠাৎ সেই অঘটনই ঘটল সাঁ-সুশীতে। একচল্লিশ সাল। এগারোই অকটোবর। বিদেশাগত শিল্পীদের কলকাতার মঞ্চে সেই প্রথম অবতরণ। যে-এশথারের নামে একদা দর্শকচিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠত, সে এশথারের উজ্জ্বলতা হঠাৎ যেন সে রাতে ম্লান হয়ে গেল। যার কটাক্ষে দর্শকদের মনে আগুন লাগত, সে দৃষ্টি দাহ হারিয়ে ফেলল। আর এশথারের সব লাবণ্য কেড়ে নিয়ে যিনি কলকাতার নববসন্ত আনলেন তিনি হলেন 'অ্যাডেল্‌ফি' থিয়েটারের সেই বহু-বিখ্যাত নটী ডিকল। মিসেস ডিকল। যাঁর ক্লিওপেট্রা অভিনয় ইংরাজ যুবকের মাথা ঘুরিয়ে ছাড়ত।

এশথারের মনে হল মিসেস ভিকলের এই খ্যাতির পিছনে নিশ্চয় একটি ষড়যন্ত্র রয়েছে। দর্শকদের তিনি বোধ হয় টাকা খাইয়েছেন। পাগলের মতন দৌড়ে গিয়েছিলেন এ অভিযোগ নিয়ে। মিসেস ভিকল অবাক। তারপর তাঁকে বের করে দিয়েছিলেন ঘর থেকে। সব কথা ফাঁস করবেন বলে এরপর এশথার দৌড়ে ছিলেন মঞ্চের দিকে। সেখানেও বাধা পেলেন।

শেষ বেশ অন্ধকার নিঃসঙ্গতায় নেমে এলেন এশথার। অভিনয় তখন আর নেশা হয়ে রইল না। শুধু দিনযাপনের গ্লানি হয়ে দাঁড়াল। তবে তখনো তাঁর পূর্ণাহুতি বাকি। বছর দুই পরে সেই চরম দিনটি এলো।

সেবার শীতকাল। নভেম্বর মাস। 'দি ওয়াইফ' নয়, অভিনীত হচ্ছিল 'হ্যাণ্ডসাম হাসব্যাণ্ড'। শ্রোতৃবর্গ যখন বিহ্বল হয়ে অভিনয় দেখছেন, হঠাৎ চীৎকার উঠল, 'ফায়ার-ফায়ার! হেলপ-হেলপ।' মঞ্চের পিছন দিকটি আগুনের শিখায় আলোকিত হয়ে উঠল। সারা থিয়েটার গৃহে সে কী উত্তেজনা! কিন্তু না, থিয়েটার বাড়িতে আগুন লাগেনি। আগুন লেগেছে নায়িকা এশথারের পোশাকে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। দৌড়ে গেল সকলে। আগুন নেভানো হল। কিন্তু তার আগেই দুটি হাত ও দুটি বাহু পুড়ে গেছে। গলায় সাংঘাতিক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

থিয়েটার সংলগ্ন একটি কোয়ার্টারে তিনি থাকতেন। কয়েকদিন ধরে সেখানে খুব ভিড়। এলেন ডাক্তার। এলেন ধর্মযাজক। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে কয়েকদিন ধরে এশথারের কুশল নিয়ে গেলেন। অনেকেই আশ্বাস দিলেন যে, শীঘ্রই তিনি নিরাময় হয়ে উঠবেন। মঞ্চে আবার অভিনয়ও করতে পারবেন।—বিধাতা পুরুষ সম্ভবত ঐ স্তোকবাক্যে মৃদু হাসলেন।

হ্যাঁ, সেই চরম মুহূর্তটি এলো। গভীর নিষুতি রাত। চাপা কান্নায় সে রাতে সাহেবপাড়ায় অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত একটা। ঠিক এমনি রাতেই চৌরঙ্গীতে আগুন লেগেছিল। ক্যালেণ্ডারের তারিখটি সবে বদল হয়েছে। সেদিন আঠারোই নভেম্বর। চৌরঙ্গী থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন হায় হায় করে উঠেছিল কলকাতার সকলে। আজও তারা সেইরকম করল। কেঁদে ফেলল অনেকে।—সেই ভয়ঙ্কর রাতে অনেকেই নেমে এসেছিলেন পথে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন। অনেকের মনে হয়েছিল অ্যাপোলো ডুবে যাচ্ছেন। সেকস্‌পীয়ার যেন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।—'আপোলো সিঙ্ক, অ্যাণ্ড সেকস্‌পীয়ার সিজ টু রেন্‌।'

এশথারের মৃত্যুর পর মঞ্চলক্ষ্মী সত্যি সত্যিই চলে গেলেন কলকাতা থেকে। মাস তিনেকের ভেতর ব্যর্থ হয়ে মিসেস ডিকল ফিরে গেলেন দেশে। ছ' বছর পরে থিয়েটারটিই উঠে গেল। পরে সে থিয়েটার বাড়িতে গড়ে উঠল 'সেনট জেভিয়ার্স কলেজ।' জানি না, অনেক গভীর রাতে আজো এশথার সেখানে তাঁর প্রিয় নাট্যমঞ্চটি খুঁজে বেড়ান কী না! আজো তাঁর গভীর দুঃখপূর্ণ গান শোনা যায় কী না কে জানে?

ছয়

বিদেশিনী বিষাদিনী

একশ তেত্রিশ বছর আগেকার একটি দিন।

সেদিন সুদূর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দর থেকে একটি জাহাজ আসছিল কলকাতার পথে। ছোট্ট জাহাজ। নীল সমুদ্রের বুকে আঁকি-বুকি কাটতে কাটতে ভেসে আসছিল জাহাজটি। মাথার ওপর নির্মল নীল আকাশ, নিচে নীল জলের অনন্ত বিস্তার।

জাহাজের মালিকের নাম হেনরী। সেদিন সকালে কিন্তু হেনরীর মনটা বড়োই অপ্রসন্ন। তার চোখে মুখে বড়োই অসহায় ভাব।

ডেকের ওপর স্ত্রীর পাশেই ঐ অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেনরী। স্ত্রী অভিমান করে দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে তাকিয়ে। সুন্দরী স্ত্রী, তাই তার অভিমান বড়ো প্রবল। শ্রীমতীর মুখের ওপর চোখ রেখে কীভাবে মান ভাঙানো যায়, সে কথাই মনে মনে ভাবছিলেন সাহেব।—শ্রীমতীর রেশম-সোনালী চুলে সমুদ্রবাতাস তখন উতরোল। ফুলে ফুলে উঠছে কেশদাম। আবার কখনো আবৃত করছে মুখশ্রী—অধর-কপোল-চিবুক। আর নীল চোখে ঝলসে উঠছে 'বে-অব-বেঙ্গলের' নীল ঢেউ।

সহর কলকাতার সঙ্গে হেনরীর পরিচয় ছিল অনেক আগে থেকেই। কেননা, সাহেব ছিলেন বেজায় ডাকাবুকো। তাঁর পুরোনাম, হেনরী দেরম্যাঁভিয়ে। নামেই মালুম যে সাহেব ফরাসী। শৈশব থেকেই এ সাহেবটি ছিলেন অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। বিপদের ভেতর ঝাঁপিয়ে না পড়লে আনন্দ পেতেন না হেনরী। তাই অতি অল্প বয়সে এবং অল্প আয়াসে তাঁর একটি চাকরী জুটে গিয়াছিল বাণিজ্য জাহাজে। সেদিন ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য প্রসন্ন। ইতিহাস

অনুকূল। ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৈরী করছে নতুন নতুন উপনিবেশ। আর ইউরোপের ঘরে বহন করে নিয়ে আসছে অভাবিত সৌভাগ্য।

হেনরীর ভাগ্যে তেমন বেশি কিছু অবশ্য জোটে নি। তবে অল্প সময়ের ভেতর হয়ে গিয়েছিলেন এক বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপটেন। আর পরিণয় হয়েছিল এক ইংরেজ ললনার সঙ্গে। সে ললনা ছিল টেলর সাহেবের মেয়ে। মিস টেলর। ফরাসী হেনরীকে বিয়ে করে ইনি হন মাদাম দেরম্যাভিয়ে। কুমারী জীবনে মাদামের ঝোঁক ছিল অভিনয়ে। অভিনেত্রী হিসাবে বেশ ভালোই তাঁর নাম হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার মঞ্চে এক ডাকে সকলে চিনত তাঁকে। অনেক ছিল তাঁর মুগ্ধ অনুরাগী।

অবশ্য এর ফাঁকে না কী একটি গোপন কাহিনী আছে। একান্তই গোপন। অষ্ট্রেলিয়া-মঞ্চে যখন তিনি অভিনয় করতেন তখন উনি মিস্ টেলর নন, মিসেস্ টেলর। টেলর সাহেবের মেয়ে নন, বধূ। অপদার্থ টেলরকে ছেড়ে দিয়ে এই মানিনী অভিনেত্রী মারিয়া ম্যাডলিন টেলর নতুন এক প্রণয়ী বেছে নিলেন। এই নতুন প্রণয়ী আর কেউ নয়, এর নাম হল পিরে লারগেট। এই পিরে নতুন নাম নিলেন, 'হেনরী দারম্যাভিয়ে।' গোপন এই জীবন কাহিনীটি সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে নতুন করে এবং নতুন-জীবনের রোমান্স নিয়ে এরা পাড়ি দিলেন কলকাতা।

এখন থেকে এরা নতুন কপোত-কপোতী, শ্রী ও শ্রীমতী হেনরী।

বিয়ের পর হঠাৎ একদিন হেনরী সঙ্কল্প নিয়েছিলেন যে পাড়ি দেবেন কলকাতায়। তারপর বেরিয়ে পড়লেন এই জাহাজ নিয়ে। এবিষয়ে শ্রীমতী হেনরীরও খুব উৎসাহ দেখা গেল। থিয়েটারের আকর্ষণ যদিও উতলা করেছিল মাঝে মাঝে, তবু অস্ট্রেলিয়া তাঁকে পারল না ধরে রাখতে। হেনরীর মুখে নায়িকা কলকাতার মঞ্চ ও অভিনয়ের কথা শুনেছিলেন, সে টানই এখন দুর্বার হয়ে উঠল।

কলকাতার পথে এই সমুদ্রযাত্রা প্রথম প্রথম খারাপ লাগেনি। বরং ভালোই লেগেছিল। ঐ নীলজলের সীমাহীন বিস্তার। ডেকের ওপর বসে বসে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আশ্চর্যরকম ভালো লাগত চাঁদনী রাত, ভালো লাগত, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মুহূর্তটুকু।

কিন্তু সপ্তাহখানেক যেতে না যেতে সব কিছুই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। স্বাদ হারিয়ে গেল প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায়। শ্রীমতীর কাছে তখন যেন আর কিছুই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়তে ইচ্ছা হয় কান্নায়। কেমন যেন এক নিঃস্তব্ধতা তাঁকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

এমন বিষণ্ণ কান্নার মুহূর্তে মাদাম দেরম্যাঁভিয়ের সব থেকে যাকে খারাপ লাগছিল, সে হল হেনরী। হেনরীকে তার মনে হচ্ছিল একটি ডাকাত। কিংবা কোন লুটেরা দস্যু। অথচ হেনরী তাঁকে কত যত্নই না করতেন! কতই না বোঝাতেন।

সেদিনও হেনরী তাঁর মানিনী বধূকে কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আঁকিবুকি কাটলেন শ্রীমতীর রেশমী চুলে। বললেন. 'ডার্লিং, তুমি ভেঙ্গে পড়ো না। আর দুদিনের ভেতরেই আমরা পৌঁছে যাবো স্যাণ্ড হেডস। তখন কলকাতা আর কতদূর! হাতের মুঠোয়।—ডার্লিং, কলকাতা এক আশ্চর্য সহর। তোমাদের একজন স্বজাতি তৈরী করেছে এ সহর। এখন তোমাদের ভাষায় একে বলা হয়, 'সিটি অব প্যালেসেস'। আগে কোনো প্যলেস ট্যালেস কিচ্ছুটি ছিল না। ছিল জঙ্গল আর জঙ্গল। আমাদের দেশে যখন ফরাসী বিপ্লব হয়, তার বছর পনেরো-কুড়ি আগেও এখানকার জঙ্গলে তোমাদের ওয়ারেণ হেস্টিংস হাতীতে চড়ে বেরুত বাঘ শিকার করতে। ডার্লিং, তুমি কী ওয়ারেণ হেস্টিংসের ছবি দেখেছ?'

ডার্লিং নীরব। আন্দোলিত বাতাসে কেবল সোনালি চুলে ঢেউ উঠল। হেনরী মনে করলেন তাঁর অভিনেত্রী বধূ হয়ত অভিনয়ের কথা শুনে খুশি হবেন। তাই প্রসঙ্গ বদলে আরম্ভ করলেন, 'তুমি

নিশ্চয় জানো না, তোমাদের কলকাতার ইংরেজরা কী ভয়ঙ্কর থিয়েটার পাগল। নিউজ পেপার বের হবার অনেক আগেই ওখানে থিয়েটার-পত্তন। আর 'ক' বছর গেলেই ওখানকার নাটুকে সাহেবরা হয়ত থিয়েটারের সেন্টিনারী করে বসে থাকবে। তবে মজার ব্যাপার কী জানো, কোনো এক বিশেষ থিয়েটার ওদেশের মাটিতে বেশি দিন টেকে না। ম্যাডাম, ডেভিড গ্যারিকের নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। একটা টেকসই থিয়েটার তৈরী করবার জন্য ওখানকার সাহেবরা গ্যারিকের কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠাল। গ্যারিক ভারি খুশি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মূল্যবান উপদেশ।—তখন সেই মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে কলকাতার ইংরেজরা কী করল জানো ?'

শ্রীমতীর চোখে সামান্য একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল ঘাড় নেড়ে বলল, 'না'।—হেনরী এতেই খুশি। দ্বিগুণ উৎসাহে সে হাসি হাসি মুখে বলল : 'কলকাতার ইংরেজরা গ্যারিককে একটি মজার উপহার পাঠালো। মজার উপহার। আর সে উপহারটি কী জানো ?—একজোড়া কাঠের পাইপ।'

বাংলাদেশের উপকূলের খুবই কাছাকাছি ছিল জাহাজটি। আকাশে তাই কয়েকটি সমুদ্রের পাখিকে দেখা গেল। দেখা গেল ঢেউয়ের মাথায় কখনো দেখা যায় বিন্দুর মতন। আবার কখনো বা তারা হারিয়ে যায়। সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি হাজার হাজার মণি-মুক্তোর মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে সমুদ্রের জলে। মাদাম দেরম্যাঁ ভিয়ের চোখে তারই অনিন্দ্যসুন্দর অনুভূতি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ হাসিতে। সে হাসি দেখে হেনরী রীতিমত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকেন, 'কলকাতায় গেলেই, ডার্লিং, আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে। ওখানকার বাতাসে শুনেছি ইউরোপীয়দের 'ফরচুন' উড়ে বেড়াচ্ছে। যে যেমনভাবে পারে, গুছিয়ে নিচ্ছে। আমার এক বন্ধু আছে তার নাম স্টোকেলার।—ভেরি অ্যাম্বিশাস ইয়ং-ম্যান। ওখানে 'ইংলিশম্যান' বলে একটি কাগজ আছে, সে তারই

এডিটর। কিন্তু কাগজের এডিটর হলে কী হয়, ভারি অভিনয় পাগল মানুষ। ওখানকার থিয়েটার মহলে সে একটা কেষ্ট-বিষ্টু। আরেকজন আমার ইন্টিমেট বন্ধু আছেন, তাকেও তুমি চেনো না। সে বন্ধুটির নাম, জর্জ হ্যামিলটন ককস। খুব সুন্দর চেহারা তার। এককালে সৈনিক ছিল। ছিল ক্যাপটেন। এখন কাজ করে ফায়ার ইনসিওরেন্সে—মাই লেডি, মাই ডার্লিং, এরা সকলেই আমাদের আপনার লোক। খুব কাছের লোক। এরা সাহায্য করবে আমাদের ফরচুন তৈরীতে। কলকাতা বন্দরে গিয়ে নামলে এরা করে দেবে আমাদের জন্য সকল রকম সুব্যবস্থা।—তুমি থিয়েটার করবে, আর আমি এই জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াব নানান দেশের বন্দরে বন্দরে।'

হেনরীর পালতোলা জাহাজ তখন জোরে বাতাস ধরেছে। হু হু করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। সে আঠারোশ একচল্লিশ সালের কথা। বাংলা দেশে তখন বসন্ত কাল। সহর কলকাতাতেও তাই। গাছে গাছে নানান ফুলের মেলা। নানা রংয়ের রং-বাহার। দক্ষিণের বাতাসটুকু ভারি মনোরম। ফাগুন 'যাই যাই' করে চলে গেল। পা-পা করে এগিয়ে এলো চৈত্র। সহর কলকাতার আয়েসী মানুষেরা সেদিনের মধুবাতাসেও অনুভব করলেন চোরা গরম।

কলকাতার সাংস্কৃতিক দিকেও চলেছে এমনি চোরা গরম। রামমোহনের কাল থেকে সবে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ইয়ংবেঙ্গলরা তখন রীতিমত উগ্র। মধুসূদন-বিদ্যাসাগর-ভূদেব তখনও ছাত্রজীবনের কুঁড়ির ভেতর সমাহিত। হেম-বঙ্কিম নিতান্তই শিশু। তখনো অবশ্য মাথার ওপর রয়েছেন হেয়ার সাহেব। ক্যাপটেন রিচার্ডসন দুহাতে কবিতা লিখছেন এবং রসিয়ে রসিয়ে শেকসপীয়ার পড়াচ্ছেন হিন্দু কলেজে। মোটকথা, সহর কলকাতায় সেদিন সুদিন। নবযুগের ইতিহাসে ভরা বসন্ত। সেই বসন্ত আমাদের চোখে আনল সোনালি স্বপ্ন। মাদাম দেরম্যাঁভিয়েও স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বামীর হাত ধরে পৌঁছুলেন এসে কলকাতায়। জাহাজঘাটে অনেকেই এলেন

তাঁদের দেখতে। এলেন স্টোকেলার, এলেন হ্যামিলটন কক্স। তাঁরা হাত তুলে উভয়কে বিশেষভাবে স্বাগত জানালেন।

হেনরী দেরীমা্যাঁভিয়ে রসিকতা করে বললেন, 'ডার্লিং, এঁদের চিনে রাখো। যদি আমি কোনো দিন হুম করে মরে যাই, এঁরা তোমাকে দেখবেন। দরকার হলে বিয়েরও ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

সকলে হা-হা করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীও।

সেদিন অপরাহ্ণে মাদামকে নিয়ে সকলে বেরোলেন কলকাতা পরিক্রমায়। না, ঠিক কলকাতা নয়। থিয়েটার পাড়ায়। বসন্তের অপরাহ্ণে চারদিক ভারি মনোরম। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। পলাশে শিমূলে তখন রংয়ের খেলা। গাছে গাছে নানা রংয়ের পাখি বেড়াচ্ছে নেচে-নেচে। তবে কলকাতার রাস্তায় বড়োই ধূলো। মাঝে মাঝে এক আধটি ঘোড়ার গাড়ি যায়, আর সারা অঙ্গ ভরে যায় ধূলোয়। এঁরা সকলে ঢাকা পালকিতে চলেছিলেন বলে কোন অসুবিধা হল না। ধূলোর মেঘ দেখলেই এঁরা টেনে দিচ্ছিলেন পালকির পরদা।

থিয়েটার পাড়াটি ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালই লাগল মাদামের। সেদিনের সাঁ-সুশী থিয়েটারের অপূর্ব শোভা দেখে ধরাই যেত না অতীত দিনের সঙ্কট-শঙ্কিল মুহূর্তগুলিকে। ছেলেখেলা করতে করতে একদিন কয়েকজন সাদা মানুষ যে বড়ো একটি খেলার পত্তন করেছিলেন, সেদিন তা পূর্ণ মহিমায় বিকশিত। শ্রীমতীর চোখে অবশ্য সে অতীত-স্মৃতি কোন কৌতূহল জাগাল না। মাঝে মাঝে যে পাদ-প্রদীপের আলো নিভে গিয়েছিল এবং রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে যে অনেক প্রতীক্ষার মুহূর্ত কেটেছিল, স্টোকেলারের মুখে সে সব কাহিনী শুনেও রোমাঞ্চিত হল না শ্রীমতীর চিত্ত। কেননা, সেকালের সাঁ-সুশীকে দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হত যে, আশঙ্কার আর কোনো কারণ নেই। মনসন-বারওয়েল-ইম্পের দাক্ষিণ্যের যুগ সে পেরিয়ে

এসেছে অনেককাল। এমা ব্র্যাংহামের শখের থিয়েটারের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকার দিন কেটে গেছে। 'হোয়েলার প্লেস' থিয়েটার এবং 'এথেনিয়ামে'র ব্যর্থতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল চৌরঙ্গী রঙ্গমঞ্চের খ্যাতির সৌধ। দূরদূরান্ত ও দেশ-দেশান্তরের মানুষ শুনেছিল এখানকার নাম। এ মঞ্চের অভিনেত্রী লিচ স্বদেশের মঞ্চেও অভিনয় করে দেশজোড়া নাম কিনেছিলেন। এবং সেই চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে একদিন ছাই হয়ে গেল। হঠাৎ আগুন কেড়ে নিল কলকাতার গৌরব।

তারপর? তারপর কিছুদিন অন্ধকার। অভিনেত্রী এশথার লঙ্গে স্টোকেলার, এবং আরো অনেকে নামলেন নতুন উদ্যমে। নতুন থিয়েটার তৈরীর সঙ্কল্প নিয়ে। সেই উদ্যম আর সেই সঙ্কল্প থেকেই তৈরী হল সাঁ-সুসী। নাট্যকে সাহেবদের চোখেমুখে দেখা দিল খুশির ঝিলিক। ওদিকে দমদম-বৈঠকখানার আসরও জমজমাট, সেখানকার মঞ্চে নিত্য নতুন নাটক।

না, শ্রীমতী দেরম্যাঁভিয়ে দমদম-বৈঠকখানার পথে আর পা বাড়ালেন না। তিনি দেখতে চাইলেন 'টাউন হল'। সুপ্রিম কোর্টের পাশের সেই বাড়িটি। এরকম একটি বাড়ীর জন্য সুদীর্ঘকাল স্বপ্ন দেখেছিল সেকালের কলকাতা। এটি তৈরী হয়েছিল লটারী কমিটির টাকায়। সে আঠারোশ ছয় সালের বৃত্তান্ত। তিন যুগ আগের ব্যাপার। গারস্টিন আর অবেরী নামে দুজন সুদক্ষ এঞ্জিনীয়ার তৈরী করেছিলেন এ বাড়ি। কলকাতাবাসীর স্বপ্নকে রূপ দিয়েছিলেন তাঁরা বাস্তবে। এরকম প্রশস্ত ও পরিসরওয়ালা বাড়ি সহর কলকাতার সেদিন দুটি ছিল না। হাজার কয়েক লোক একসঙ্গে বসে সভা করতে পারত। শুধু সভা? নিত্য এখানে লেগে থাকত অভিনয়। টাঙ্গানো হত থিয়েটারের পর্দা। নাচে-গানে জম-জমাট হয়ে উঠত মঞ্চ। সারা কলকাতার লোক সেদিন নাটক-পাগল, সুতরাং টাউন হল কী তা থেকে বাদ থাকতে পারে?

শ্রীমতী দেরম্যাঁভিয়ে কলকাতা বন্দরে পা দিয়েই শুনেছিল যে তার অভিনয় করবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছে। আর সেই অভিনয়স্থল ঠিক হয়েছিল, 'টাউন হল।'—অভিনয়ের নাটক ?—হ্যাঁ, তাও ঠিক। নাটকটির নাম, 'টেমিং অব দি শ্রু'। মানিনী দেরম্যাঁভিয়ে নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কি শ্রু ?' না, তা কেমন করে হবে ? শ্রু মানে ত 'কলহ-পরায়ণা'। খুব মোটা করে যাকে বলে 'কুঁদুলী', তাকেই বলে শ্রু। না, দেরম্যাঁভিয়ে তা নয়, সে মানিনী, অভিমানিনী। কে জানে সহর কলকাতা এ মানিনীকে বশ করবার কোন ষড়যন্ত্র পাকা করে রেখেছে কী না।

কলকাতার মাটিতে মাদামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার অভিনয়ের খবর। পঁচিশে মার্চ 'টাউন হলে' হবে সে অভিনয়। ক্যাথেরিনা ও ডার্লিংটনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে তাঁকে। কলকাতার কাগজে কাগজেও বেরিয়ে পড়ল এ খবর। আরম্ভ হয়ে গেল টিকিট বিক্রয়। হোটেল স্পেনসেস ও হোটেল অকল্যাণ্ডে খোলা হল টিকেট-কাউন্টার। কাগজ অফিস 'হরকরা'ও বাদ গেল না এ সুবর্ণ সুযোগ থেকে। যদিও তখন খ্রীষ্টান মহলে 'প্যাসন উইক' আসন্ন, তবু উৎসুখ নাট্যমোদীরা তাকিয়ে রইল পঁচিশ তারিখের দিকে। 'বেঙ্গল হরকরা' আরো উদ্দীপিত করে তুলল নতুন অভিনেত্রী সম্পর্কে কৌতূহল। লিখল : 'এঁর সম্পর্কে যে সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে, সকল দর্শককে ইনি যে প্রীত করবেন, সে বিষয় আর সন্দেহ কী ?'

এইভাবে একান্তমনে গোটা কলকাতা যখন নতুন অভিনেত্রীকে দেখবার জন্য তৈরী হচ্ছে মনে মনে, তখন দুম করে একটি ঘটনা ঘটে গেল।

ঘটে গেল একটি অঘটন। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সে দুঃসংবাদ।—শোনা গেল, মাদামের সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ। সকলে দৌড়ুল তার কাছে। গিয়ে দেখে সে এক অভাবিত পরিস্থিতি।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন এ ফরাসী-বধূ। মাথায় ভেঙে পড়েছে আকাশ। স্বামী শ্রীযুক্ত দেরম্যাঁভিয়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে আছেন।

কেন?—কেন? সকলের মুখেই উত্থত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন। কোন জবাব পাওয়া গেল না শ্রীমতীর কাছে। দু গাল বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। কিন্তু নগর কোটাল নীরব থাকলেন না, জিজ্ঞাসুদের কৌতূহল মেটালেন তাঁরা। কোটালমশাই গম্ভীরভাবে জানালেন, মসিয়ঁ দেরম্যাঁভিয়ে একজন সভ্য মানুষ নন, সভ্যতার খোলশ পরা এক ডাকু। লুটেরা। জাহাজ চুরি করে এই লুটেরা পালিয়ে এসেছেন কলকাতায়। ভেবেছিলেন জানতে পারবে না কেউ, থাকবেন গা-ঢাকা দিয়ে। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। কলকাতার কোতো-য়ালিতে খবর পৌঁছুল। গোপন খবর। লোকলস্কর নিয়ে এঁরা বেরোলেন চোর ধরতে, কিন্তু তার আগেই চোর জেনে ফেলল খবর। অপমানের আঁচড় গায়ে লাগতে দেবার আগেই করে বসলেন সুইসাইড।

অজনা দেশ। অচেনা মানুষ। সহায়-সম্বলহীনা এক মহিলা। তার ওপর সে যদি আবার সুন্দরী তরুণী হয়, তার ভয় অনেক। আর সম্ভ পতি-বিয়োগের শোকে ত আছেই! শোকে ও ভয়ে বড়োই কাতর হয়ে পড়লেন শ্রীমতি দেরম্যাঁভিয়ে। কাঁদলেন আকুল হয়ে।

এ ক'দিনে সামান্য পরিচয় হয়েছিল যাঁদের সঙ্গে, তাঁরা অবশ্য অনেকে সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে এলেন। এলেন স্টোকেলার। এলেন জর্জ হ্যামিল্‌টন ককস। হ্যামিল্‌টন আরো ঘনিষ্ঠ হলেন। ডাকাতের বৌ বলে ঘৃণায় তিনি দূরে ঠেলে দিলেন না।

অথচ এ সাহেব কতো বড়ো কুলীন। সেকালের 'বেঙ্গল ক্লাবে' সাহেবের বাসা। সপরিবারেই হয়ত থাকতেন। তবে এ সময় তাঁর

কাছে স্ত্রী কাছে ছিলেন না। ছিলেন স্বদেশে। ইংলণ্ডে। 'বেঙ্গল ক্লাবের' বাদশাহী আরামে সাহেব একাই ছিলেন আত্মলীন। অভিজাত ব্যক্তি না হলে এখানে সেদিন স্থান সংগ্রহ করা ছিল কঠিনতর। হ্যামিল্‌টন সেই অভিজাত্যের চূড়োয় গিয়ে বসেছিলেন। সামরিক কাজে অবসর নিয়ে তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বীমা কোম্পানীর দায়িত্বভার। এ সহরে তখন সবে ফায়ার ইন্সিওরেন্সের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেই প্রারম্ভিক কর্মযজ্ঞে হ্যামিল্‌টন কক্‌স লেগে গিয়াছিলেন নবীন উদ্যমে।

তবে সাহেবের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। ঘরে দজ্জাল স্ত্রী। সে মহিলা এতটুকু সুখ দিতেন না সাহেবকে। বন্ধু-বান্ধব থেকে আরম্ভ করে পাড়া প্রতিবেশী, ইউরোপীয় সমাজ, কক্স সাহেবের এই ব্যর্থ দাম্পত্যজীবনের খবর সকলেই জানতেন। মন্দ লোকেরা আবার তাঁর এই 'ডোমেস্টিক অ্যাফলিক্‌সনের' কথা আলোচনা করত রসিয়ে রসিয়ে।

কোথায় তালতলা, আর কোথায় বেঙ্গল ক্লাব। কোথায় কক্‌স সাহেব আর কোথায় দেরম্যাডিয়ের নবপরিণীতা বধূ! অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান। কিন্তু দুটি প্রান্ত মিলল দুঃখের বন্ধনে। একজনের দুঃখ পতিবিয়োগে, অপরের দুঃখ দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতায়।

কলকাতায় সেদিন বসন্ত বড়োই উগ্র হয়ে উঠেছে। দুপুরের দিকে চোরা গরম। লাল ফুলের আভরণ পরেছে পলাশ শিমূল। মৌমাছিদের গুঞ্জনে বেঙ্গল ক্লাবেরফুলের বাগান কেমন যেন মোহময়!

দিনে দুবার করে হ্যামিল্‌টনকে যেতে হত তালতলার বাড়িতে। বেঙ্গল ক্লাব থেকে এ বাড়ির দূরত্ব একটু বেশি বটে, কিন্তু পালকিতে চড়ে একটি মিষ্টি স্বপ্ন দেখতে দেখতে এই দূরপথ যেতে ভালই লাগত সাহেবের। তখন অনেক গাছ ছিল কলকাতায়। গাছে গাছে শোনা

যেত পাখির মিষ্ট কাকলি। দেখা যেত রঙ-বেরঙের পাখি। স্নিগ্ধ পল্লীশ্রী মাখানো ছিল সহর কলকাতার অঙ্গে অঙ্গ। সেই শ্রী দেখতে দেখতে ও পাখির গান শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়ে যেতেন সাহেব।

মাঝে মাঝে দেখা হত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। কিন্তু ভাল করে কথা বলতে ইচ্ছা করত না। কেমন যেন এক ক্লান্তি আসত। একদিন সাহেব গেলেন স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ডাঃ গুডিবের কাছে। সেকালের কলকাতায় ডাঃ গুডিব পয়লা নম্বর চিকিৎসক। একালের বিধান ডাক্তারের মত ছিল তাঁর খ্যাতি। সেই ডাক্তার যত্ন করে পরীক্ষা করলেন হ্যামিল্টনকে, তারপর হা-হা করে হেসে বললেন, 'ভালোই আছো দেখছি। এক্সেলেণ্ট হেল্‌থ।'

'কিন্তু পায়ে যে একটু ব্যাথা লাগে'—হাসি হাসি মুখে বলেছিল হ্যামিল্টন।

'না না। ও কিছু না। ওটা বাত।'

আরেকদিন হ্যামিল্টন গেলেন স্টোকেলারের কাগজের অফিসে। সম্পাদকের বিরাট টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন স্টোকেলার। খুবই ব্যস্ত। তবু হ্যামিল্টনকে দেখে হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। বললেন 'কী ব্যাপার! মাদাম দেরম্যাঁভিয়ের কাছে গিয়েছিলেন না কী?'

'হাঁ গিয়াছিলাম। সেখান থেকেই আসছি। তাঁর অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দাও।'

'তাঁর সম্মতি পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

স্টোকেলার বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আসছে সপ্তাহেই অভিনয় হবে।'

ব্যস, ব্যবস্থা হয়ে গেল অভিনয়ের। নিঃস্ব ফরাসী বধূর এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। শোকে মুহ্যমান হলেও, জীবিকার জন্য তাঁকে নামতে হল মঞ্চে। অবশ্য নামবার আগে যথারীতি আরম্ভ

হয়ে গেল বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ। সেই একই নাটক, 'টেমিং অব দি শ্রু'। সেই একই স্থান, 'টাউন হল'।

চৈত্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে টাউন হলে সেই বহু প্রতীক্ষিত সন্ধ্যাটি এলো। সাহেবটোলায় তখন 'প্যাসান উইক' চলেছে। মেম সাহেবরা এই প্যাসেন উইক নিয়ে মগ্ন। টাউন হলে সমবেত ও কৌতূহলী দর্শকদের কাছে দাঁড়াল গিয়ে নতুন অভিনেত্রী। শান্ত বিষণ্ন মুখ। চোখ দুটি জলে ভেজা। নতুন অভিনেত্রীরা সেকালে প্রথম মঞ্চ-আবির্ভাবের মুহূর্তে আত্মকথা ব্যক্ত করে নান্দীমুখ পাঠ করতেন। মাদাম দেরম্যাঁভিয়েও তাই করলেন। বললেন তাঁর দুঃসহ যন্ত্রণার কথা। মাঝে মাঝে কণ্ঠস্বর ভেঙে এলো কান্নায়। সেই কান্নাভরা কণ্ঠে ফরাসী-বধূ নিবেদন করলেন :

> দি উওম্যান, নট্ দি অ্যাকট্রেস, স্পিকেথ নাউ
> এলাস ! টু সুন মাস্ট আই রিজিউম দি মাস্ক !
> নেসাসিটি কমাণ্ড্স্ মি টু টাস্ক।

কোনো অভিনেত্রীর ভূমিকায় নয়, সামান্য এক নারী হিসাবে আপনাদের কাছে এসে কথা বলছি। হায়, এত শীগ্গির আমাকে মুখোশ পরতে হবে ! প্রয়োজন আমাকে চাবুক মারছে। কামাণ্ডস্ মি টু টাস্ক !

অভিনয়-শেষে সে রাতে নিজের পালকি করেই অভিনেত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন জর্জ হ্যামিল্টন কক্স। গভীর দুঃখভারে ভেঙে পড়লেও মাদামের অভিনয় যে উৎকৃষ্ট, তা অনেকেরই চোখে পড়ল। তবে যথেষ্ট লোক সেদিন অভিনয় দেখতে আসে নি। এটুকুই ছিল কক্স-হ্যামিল্টনের কাছে দুঃখের ব্যাপার। অনেকে বলল : 'প্যাসান উইক চলছে বলে মেমসাহেবরা আসতে পারলেন

না।' কাগজঅলারা লিখল: 'অভিনেত্রীর অপূর্ব তনুশ্রী এবং সুরেলা কণ্ঠস্বরে মোহিত না হয়ে পারা যায় না।'

'না, কোনোটাই নয়,' মনে মনেঃভাবলেন হ্যামিল্‌টন কক্স। পরে স্টোকেলারকে ডেকে বললেন, 'সাঁ-সুশীর অমন আরাম ছেড়ে অমন গ্ল্যামার বাদ দিয়ে, কে 'টাউন হলে' থিয়েটার দেখতে আসবে? যদি মাদামকে দাঁড় করাতে চাও, তবে মাদামের জন্য সাঁ-সুশীতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

যে কথা, সেই কাজ। মাদামের জন্য সে চেষ্টা চলল।

এরপর শ্রীমতী দেরম্যাঁভিয়ের কিছুদিনের জন্য অভিনয়ের-বিরতি। আরো ভালো অভিনয়ের জন্য এই অনাথিনী বিদেশিনী তৈরী হতে থাকলেন মনে মনে। তালতলার বাড়িতে একা একাই যাপন করতে থাকলেন অবকাশ। এদিকে অফিস করার ফাঁকে ফাঁকে হ্যামিল্‌টন কক্স যখনই সময় পান তখন কেবলই ভাবেন এই নতুন বান্ধবীটির কথা। অফিসের পর প্রত্যহ চলে যান তালতলায়। সেখানে দু'জনের নানারকম কথা হয়। নানা গল্প। ওঠে অভিনয়ের কথাও। এবং দেখা যায় দুজনেই স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে।

এমন স্বপ্ন কোনদিন দেখেননি তরুণী শ্রীমতী। আগেও না, পরেও না। অস্ট্রেলিয়ার জীবনের কথা না তোলাই ভালো। হেনরীকে নিয়ে সুখ পাননি একদিনের জন্যও। ডাকাবুকো মানুষ, সর্বদাই থাকতে হত ভয়ে ভয়ে। একদিনের জন্যও সুখ ছিলনা, সুতরাং স্বপ্ন দেখা ত অনেক দূরের কথা। জীবনের এ মঞ্চে পর্দা ওঠার আগেই নিভে গিয়েছিল পাদপ্রদীপের আলো। আর হ্যামিল্‌টনের কথা ত আগেই বলা হয়েছে। বেচারি ক্যাপটেন। এতবড়ো একজন সামরিক লোক হয়েও দজ্জাল স্ত্রীর কাছে চিরকাল থেকেছেন ভয়ে ভয়ে। না পেয়েছেন সুখ, না পেয়েছেন শান্তি।

আর দুজনে তাই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। অতীতকে মুছে দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করা যায় কী না, হয়ত সে কথাও বসলেন ভাবতে।

নাটকটি ভালোই জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন কয়েকটি আলো দপ্ দপ্ করে নিভে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় 'বেঙ্গল ক্লাবে' সাহেব হ্যামিল্টন কক্স একটি চিঠি দেখতে পেলেন টেবিলে। হয়ত সেদিনের ডাকেই এসেছে চিঠিখানি। ইংলণ্ড থেকে পোস্ট করা চিঠি। ডাক-বাক্স ঝেড়ে বেহারা আরো পাঁচখানা চিঠির সঙ্গে সেটি রেখে গেছে টেবিলে।

ছোট্ট একটি চিঠি। আঁকাবাঁকা অক্ষরে ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল। মাত্র কয়েকটি লাইন। বেশি নয়, শ'খানেক শব্দও চিঠিতে ছিল কী না সন্দেহ। কিন্তু চিঠিটি পড়ে সাহেবের মনে হল, না ও গুলি শব্দ নয়, শ'খানেক সৈনিক যেন উদ্যত বেয়নেট নিয়ে এগিয়ে আসছে। এখনই যেন তাকে খুন করবে। হ্যামিল্টনের হাত কেঁপে উঠল, চিঠিটা মাটিতে পড়ে গেল। আর সেদিন রাতেই সাহেব তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন: আজ স্ত্রীর চিঠি পেলাম। তিনি কিছুদিনের ভেতর কলকাতায় আসছেন। জাহাজ এখন বে অব বেঙ্গলে ঢুকেছে। সুতরাং আর কদিন?

পরেরদিন দেখা হয়ে গেল স্টোকেলারের সঙ্গে। তিনি জানলেন 'ভালো খবর আছে, মিঃ কক্স, মাদাম দেরম্যাঁভিয়ের সাঁ-সুশীর অভিনয় পাকা হয়ে গেছে।'

কক্সের মনটা প্রসন্ন ছিল না। তবু হঠাৎ খুশি ছলকে উঠল এ সুসংবাদে। কৌতূহলী হয়ে বললেন: 'কবে?'—

স্টোকেলার বললেন, 'আগামী তিরিশে এপ্রিল, শুক্রবার। এবার লিচও অভিনয় করবেন।' কক্স বললেন, 'বাঃ, ভারি সুসংবাদ! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ!'

এদিকে সেদিন অফিসে গিয়ে হ্যামিলটন কম্ব্স্ এক কাণ্ড করে বসলেন। ডবলু. এম. ওয়েস্টারমান ছিলেন তাঁর কোমপানির মাথা। সুইং ডোর ঠেলে সোজা গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। তাঁর টেবিলের ওপর পেশ করলেন লম্বা-ছুটির একখানি দরখাস্ত। কারণ? না কোনো কারণ দেখালেন না। তবে পাওনা-গণ্ডা যা ছিল, তা তুলে নেবার জন্ম অনুমতি চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও গেলেন সে অনুমতি।

এরপরে নিজের চেয়ারে এসে বসে ডেকে পাঠালেন হেড-রাইটারকে। সেকালে এই দমকল-বীমা কোমপানির হেড-রাইটার ছিলেন এক বাঙালীবাবু। বাবুর নাম কালীকুমার মুখুজ্যে। বেশ চালাক চতুর লোক এই মুখুজ্যেমশাই, আর খুবই সপ্রতিভ ও চটপটে। হ্যামিল্টন তাকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন বাবু? আপনাকে বেশ এফসিয়েন্ট মনে হচ্ছে। আমি না থাকলে অফিস চালাতে পারবেন তো?'

কালীকুমার ঘাড় নিচু করে হাসল। সাহেবও হাসলেন। বললেন, 'আমি জানি তুমি পারবে। কোম্পানির অবস্থা ভালো— স্টেডিলি প্রোগ্রেসিং—'

ইতিমধ্যে এপ্রিল মাস গড়াতে গড়াতে এসে শেষ দিনটিতে আটকে গেল। বসন্ত হারিয়ে গেল মধ্য বৈশাখে। রোদ্দুরে চাঁপা ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল। আই-ঢাই গরমে সাহেবটোলা হাঁসফাঁস করতে থাকল। আর সারা দুপুরটা টা-টা রোদ্দুরে ঝিমঝিম করতে করতে কালবৈশাখীর প্রতীক্ষায় রইল। এরই ফাঁকে সহরের কাগজঅলারা ঘরে ঘরে খবর পৌঁছে দিল যে এশথার লিচের সঙ্গে আজ রাত্তিরে অভিনয়ে নামবেন অদ্বিতীয়া শিল্পী মাদাম দেরম্যাঁভিয়ে।

সেদিন সকালবেলায় সাহেব হ্যামিল্টন ডেকে পাঠালেন তাঁর চাকরবাকরদের। পুরনো দিনের কলকাতায় সব সাহেবেরই থাকত একটি করে ভৃত্যবাহিনী। এ ভৃত্যেরা সাদা প্রভুদের সেবায় সদা নিযুক্ত থাকত। কেউ সেজে দিত হুঁকো, কেউ ভরে দিত ভিস্তিভরা জল। গরমের দিনে কেউ কেউ টানত টানা-পাখা, আর প্রতিদিন পালকি বহন করার জন্য পালকি-বেহারার দল ত' ছিলই। এই ভৃত্যবাহিনীর আবার একজন প্রধান থাকত। তাকে বলা হত হেড-বেয়ারা। সাহেবের জন্য সে কেনাকাটা করত এবং অনেক সময় টাকা-পয়সাও জমা রাখত।

ছোটখাটো বেহারাদের সঙ্গে দেখা করার পর সাহেব ডেকে পাঠালেন সর্দার বেহারাকে। সাহেবের এই প্রধান ভৃত্যটির নাম ছিল ইপ্পা। বেশ শক্ত-সমর্থ এক মানুষ। ন'দশ বছর ধরে সে হ্যামিল্টন কক্সের আজ্ঞাবহ। খুবই বিশ্বাসী। তার কাছে টাকা পয়সার সব হিসাব চেয়ে নিলেন সাহেব। দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিলেন কড়ায়-গণ্ডায়। ইপ্পা একবার কাঁদো কাঁদো মুখে জিজ্ঞেস করল, 'স্যর, আপনি কি চলে যাচ্ছেন দেশে?'

সাহেব একটু ক্ষীণ হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

ইপ্পার পর ডাক পড়ল প্রধান পালকি-বেহারা নন্দ দাসের। নন্দ ছিল ওড়িশার লোক। গোটা মাথাটা কামানো। লম্বা এক হারা চেহারা। পরিধানে স্বল্প কাপড়। সাহেবদের চোখে, 'বেয়ারহেডেড অ্যাণ্ড অলমোস্ট নেকেড।'—এই নন্দ দাস লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়াল সাহেবের কাছে। তারও দেনাপাওনা মিটিয়ে দিলেন সাহেব। দিলেন ভালো বকশিস, তারপর বললেন, বকেল চারটের ভেতর বেরুব, পালকি তৈরী রেখো।'

তৈরী ছিল পালকি। মেহগিনি ক্লকে টং টং করে চারটে বাজতেই সাহেব দৌড়ে গিয়ে উঠে বসলেন পালকিতে। সঙ্গে নিলেন একটি বাড়তি স্যুট। যদি হঠাৎ বৃষ্টিতে জামাকাপড় ভিজে যায়!

পুরনো কলকাতার রাস্তা কাঁপিয়ে নন্দ দাস সেদিন বিকেলে সাহেবের পালকি নিয়ে চলল তালতলায় মেমসাহেবের কাছে। বহুবার এসেছে নন্দ। বকশিসও পেয়েছে মাঝে মাঝে। আজ সন্ধ্যায় মেমসাহেব যে থিয়েটারে অভিনয় করতে যাবে তাও জানে নন্দ দাস।—পথে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগল।

হ্যামিলটন ওখানে গিয়ে থাকলেনও এক ঘণ্টা। সন্ধ্যার ডিনার ওখানেই খেলেন। দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেক গল্প করলেন। অনেক। হ্যামিলটন এক সময় বললেন, 'কাল থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।' 'কেন?' মাদাম দেরমঁ্যাভিয়ের চোখে ঘনিয়ে উঠল বিষণ্ণতা। সাহেব হা-হা করে হেসে বললেন, 'এমনিই।'

এরপরে দুজনে খুব তাড়াতাড়ি চলে এলেন থিয়েটারে। থিয়েটার সাঁ-সুশীতে।

এখানে এসে প্রথমে দেখা হয়ে গেল স্টোকেলারের সঙ্গে। সাংবাদিক স্টোকেলার হ্যামিলটনকে দেখে বললেন, 'আপনাকে আজ বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বয়েস অনেক কমে গেছে!' হ্যামিলটন বললেন: 'তা ঠিকই। তবে মশাইয়ের কিছু কম আমোদ দেখছি না তো?'

আরম্ভ হলো থিয়েটার। ওপরের একটি বক্সে অভিনয় দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলেন হ্যামিলটন। হঠাৎ যখন চমক ভাঙলো, তখন দেখলেন আধ ঘণ্টা কেটে গেছে।—উঠে বসলেন। মনে পড়ে গেল, কী যেন তিনি করেন নি কপালে জমে গেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুতরাং বেরিয়ে এলেন বাইরে। হঠাৎ বাঁকের মুখে সাংবাদিক স্টোকেলার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? কোথায় চললেন?'

হ্যামিলটন বললেন, 'না, কোথাও নয়। এখনই আসছি।'

না, তিনি কিন্তু এলেন না। নন্দ দাসকে ডেকে সোজা ফিরে

এলেন বেঙ্গল ক্লাবে। ক্লাবে পৌঁছে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে সওয়া নটা বেজেছে।

বৈশাখের আইঢাই গরম। ওপরের জ্যাকেট এবং ওয়েস্‌ট কোর্টটি সাহেব এক টানে টেনে খুলে ফেললেন। হাঁক দিলেন ইঙ্গাকে। ইঙ্গা এলো। দরাজগলায় বলেন, 'আভি সোডা লাও।'—এলো সোডা। সাহেব আলমারী থেকে একটি বিচিত্র আকারের বোতল বের করলেন। এবং সোডা ঢেলে নরম করে একটু ড্রিঙ্ক করলেন। তারপর একটু পা-চারি করে অঙ্গে চাপিয়ে নিলেন মর্নিং গাউনটি। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, সন্ধ্যা-বেলাকার তারাগুলি চলে এসেছে আকাশের মাঝামাঝি।

মৃদু আলো জ্বলছিল টেবিলের ওপর। সাহেব হঠাৎ একটি চিঠি লিখে ফেললেন। হাঁক দিলেন নন্দ দাসকে। নন্দ এলে তার হাতে ধরিয়ে দিলেন চিঠি। তারপর যেন উদাসভাবে বললেন, 'নন্দ, তোমাকে যেতে হবে তালতলায়। সেখানে গিয়ে এ চিঠিটা একবারে মেমসাহেবের হাতে দিয়ে আসতে হবে। আর একবারে খালি হাতে এলে চলবে না। হাতে হাতে উত্তরও আনা চাই।'

নন্দ ঘাড় নেড়ে বলল : 'যাচ্ছি হুজুর। এখনই যাচ্ছি।' তারপর মাথায় পাগরি বেঁধে সোজা রওনা দিল তালতলা।

এদিকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ইঙ্গা বসল পাখা টানতে। আই-ঢাই গরমে সাহেবরা বেজায় কাবু হয়ে পড়েন। ইঙ্গা এসব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে। তাই সে নিজে সাহেবের সেবায় সদা তৎপর। সারা রাত্তির সে সাহেবকে পাখা টেনে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। পাখার দড়িটা শোবার ঘরের দরজার মাথা দিয়ে বাইরে পর্যন্ত টানা। ভেতরে বাতাসের ঢেউ ওঠে।

সে রাতে সাহেব ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানালার পাল্লাগুলিও টেনে দিলেন একে একে। তারপর সাহেব একটু গান গাইলেন। ইঙ্গা জানে যে তার প্রভু খুশি হলে এভাবে মাঝে মাঝে

গান গেয়ে থাকেন। শুধু কী গান গেয়ে থাকেন! শুধু কী গান? মাঝে মাঝে সাহেবের আবার নাচেরও ইচ্ছা হয়। নাচেনও। সে রাত্তেও নাচলেন, ইচ্ছা পায়ে করে একটু তালও ঠুকল।

ওদিকে নন্দ দাস যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছুল তালতলায়। প্রায় এক ঘণ্টার পথ। সারাটা পথ আসতে আসতে সব ব্যাপারটিকে সে সাজিয়ে নিল নিজের মনের মতন করে। তার মনে হল, এ চিঠি পড়ে মেমসাহেব নিশ্চয় আজ রাত্তেই ক্লাবে আসতে চাইবেন। নয়ত কাল সকালেই চলে যাবেন গীর্জায়। সেখানে সাহেবের সঙ্গে-এঁর বিয়ে হবে! আহা! ভারি সুন্দর মেয়েটি। ভারি নম্র!

নন্দ তালতলায় গিয়ে দেখল মেমসাহেব সবে ফিরেছেন থিয়েটার থেকে। মুখখানি বড়ো ক্লান্ত। বড়ো বিষণ্ণ। নন্দ লম্বা একটি সেলাম দিয়ে চিঠিটি এগিয়ে দিল মেমসাহেবের হাতে। চিঠিটি হাতে নিয়ে নন্দকে মেমসাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার নন্দ। এতো রাত্রে!'

নন্দ মিষ্টি হেসে বলল, 'চিঠিতেই সব লেখা আছে, মেমসাব!'

ক্ষীপ্র হাতে চিঠিটি খুলে মেমসাহেব পড়ে ফেললেন। নন্দ দেখল, তাঁর মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। এবং কিছু না বলেই তিনি ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। নন্দ মুখখানি কাঁচুমাচু করে বলল: 'মেমসাব, চিঠির উত্তর!'—কিছুক্ষণ পরে একটি ইউরোপীয় ছোকরাকে নিয়ে মেমসাহেব এলেন বাইরে। নন্দর কাছে তাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একে নিয়ে যাও, নন্দ। এ ছেলেটিই হল আমার উত্তর। তোমাদের সাহেব একে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।'

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল নন্দর কাছে। তালগোল পাকিয়ে গেল তার ভাবনাগুলি। মেমসাহেবের কথা মত সে ঐ ছেলেটিকে নিয়ে ক্লাবে ফেরবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু তার পৌঁছুনোর আগেই এখানে দারুন একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল।

সাহেবের নাচগান শুনতে শুনতে, এক পায়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসেছিল ইন্দ্রার। হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজে ভেঙে গেল তার চটকা। বুম্—বুম্—বুম্!—সাহেবের ঘরের ভেতরেই যেন গর্জে উঠল শব্দ। লাফিয়ে উঠল ইন্দ্রা। কী যে করবে সে ঠিক করতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল সে সাহেবের দরজায়। নাঃ, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

তখন সে দৌড়ে গিয়ে খবর দিল ক্লাবের ইউরোপীয় ওয়ার্ডকে। ওয়ার্ড এলেন হন্তদন্ত হয়ে। —দরজা ভাঙলেন। এবং তারপর যে দৃশ্য দেখল ইন্দ্রা তাতে তার মনে হল পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। দেখল পিস্তলের গুলি দিয়ে সাহেব নিজেই উড়িয়ে দিয়েছেন নিজের মাথা। আর সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সাহেবের সমস্ত অঙ্গ শোণিতাপ্লুত।

এরপরের ইতিহাস এ কাহিনীর উপসংহার। পুলিশ এলো। যেমন আরো পাঁচটা খুনে তারা আসে। বসল তদন্ত, যেমন আরো পাঁচটা ক্ষেত্রে বসে। দেখা গেল যে হ্যামিলটন সাহেব সব দিক ভেবেই রেখে গেছেন সব প্রশ্নের জবাব। রেখে গেছেন কয়েকটি চিঠি। তদন্তকারীকেও এক কলম লিখে জানিয়েছেন, 'আপনারা ব্যাকুল হবেন না, অনেক ভেবে চিন্তেই আমি এ আত্মহত্যা করেছি।' তারপরে সে চিঠিতেই জানিয়েছেন একটু একটু করে কোথায় তিনি পিস্তল পেয়েছেন এবং কোথায় তিনি কিনেছেন বারুদ। একবারে শেষকালে কৌতূহলীদের সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছেন, 'ভাববেন না আমি পাগলামি করে এ কাণ্ড করেছি। না, মশাই, আমাদের বংশে কেউ কখনো পাগল ছিল না। ইন্স্যানিটি ওয়াজ নেভার বিন্ ইন্ মাই ফ্যামিলি।'

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আই সলিসিট্ দি চিপেস্ট অ্যাণ্ড মিনেস্ট ফিউনারাল—নো পাকা গ্রেভ—নো মোর্ণিং কোচ'—লিখেছেন, 'আমি অনাড়ম্বরপূর্ণ অতি সাধারণ সংকার পেলেই আনন্দিত হব। পাকা সমাধি ?—না তার কোনো দরকার নেই, দরকার নেই কোনো শোক মিছিলের।'

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আরো কয়েকখানি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন হ্যামিলটন। এদের ভেতর মুখ্য ছিলেন ডাক্তার গুডিভ এবং সাংবাদিক স্টোকেলার। তদন্ত বসল। এঁদের সকলকেই ডাকা হল তদন্তে। দুজনেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, 'ভারি আমুদে লোক ছিলেন জর্জ হ্যামিল্টন কক্স। ভারি ভালো মানুষ।' স্টোকেলার জানালেন যে মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও তাঁকে দেখেছেন এবং তখনো তিনি ভারি খুশি খুশিই ছিলেন। আর গুডিভ বললেন, 'অমন সুস্থ মানুষ খুব কমই আছে কলকাতায়। খুবই কম। সামান্য একটু বাতের ব্যথা ছিল পায়ে, কিন্তু তার জন্যে কেউ কখনো কী আত্মহত্যা করে ?'

কিমাশ্চর্যম ! তবু আত্মহত্যা করলেন হ্যামিলটন কক্স। কাগজঅলারা বলল : অসুখী দাম্পত্যজীবনই এর কারণ। স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের চিঠিটিই হল মূল। অবশ্য মন্দলোকে মাদাম দেরম্যাঁভিয়েকে ছেড়ে দিল না।

সেদিন তদন্তকারীরা কেউই মাদাম দেরম্যাঁভিয়ের কথা তোলেন নি। তার কারণ হ্যামিলটন সেরকম কোনো সুযোগ রেখে যান নি। কিন্তু মন্দ লোকেরা এমন সুযোগ ছাড়বে কেন ? তারা মাদামের দিকে বাঁকা চোখেই তাকিয়ে রইল। আর গোঁড়া খ্রীষ্টানরা এমন সুযোগ কখনো কী হেলায় হারাতে পারেন ? তাঁরা হঠাৎ কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন আসরে। কাগজে কাগজে তাঁরা কেঁদে বসলেন পরোক্ষ আলোচনা। থিয়েটারগুলির ওপর অনেকদিন থেকেই ছিল তাঁদের রাগ। ঐগুলিকে তাঁরা মনে করতেন পাপের

আড্ডাখানা! এ সুযোগে তাঁরা এদের ওপর নিয়ে নিলেন এক হাত। 'ক্রিশ্চিয়ান অ্যাডভোকেটে'র পাতায় লেখা হল 'দি থিয়েটার ওয়াজ, ফ্রম দি ফার্স্ট, দি ফেভারিট হন্ট অব সিন।' অর্থাৎ থিয়েটারগুলি আগাগোড়া নরকের দ্বার। সৎ মানুষগুলিকে পাপের ভেতর টেনে আনাই হল তাদের কাজ।

থিয়েটারগুলি যদি নরকের দ্বার হয়, হয় পাপের আড্ডাখানা, তবে তার অভিনেত্রীরা কী! এই মেয়েগুলি নিশ্চয় আরো জঘন্য। বলাবাহুল্য, মাদাম দেরম্যাভিয়েকে সেই নারকীয় কলঙ্কে লিপ্ত করা হল। পাড়ায় পাড়ায় নানা রকম রসাল ও মুখরোচক খবর ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবকাশগুলিতে সহর কলকাতা মগ্ন হয়ে রইল এইসব কুৎসিত রসিকতায়।

কিন্তু কে জানত, নাটকের ওপরেও নাটক হয়।

এবং সব থেকে মজার ব্যাপার, সেই অসম্ভব নাটকই ঘটে গেল। এবং মাত্র বারো দিন পরে। তেরোই যে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে অভিনেত্রী দেরম্যাভিয়ে মারা গেছেন।—'আনফরচুনেট ফিমেল হ্যাজ অলসো বিন রিমুভড ফ্রম দি স্টেজ অব লাইফ!' জীবনের মঞ্চ থেকেই চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে হতভাগিনী!—কারণ? কী ভাবে বিদায় নিয়েছে?—না, আত্মহত্যা নয়। হঠাৎ অসুস্থতা! হ্যামিলটনের মৃত্যু থেকে দু সপ্তাহ আর গেল না। তেরোদিনের মাথায় এক বৃহস্পতিবার সকালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে সকল যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পেলেন বিপন্না ফরাসী-বধূটি। কোনো বাঁকা কটাক্ষই আজ আর তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

এ মৃত্যুতে অনেকেই না কেঁদে পারলেন না। কেউ কেউ এ মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন। বললেন, পুরোপুরি আত্মহত্যা না হলেও এটি যে আত্মত্যাগ, তা সুনিশ্চিত!

খ্রীষ্টান কাগজগুলির কিন্তু এতেও মন ভিজল না। সুন্দরীদের ওপর যেন তাঁদের চিরকালের আক্রোশ। যে-রমণীর পাল্লায় পড়ে

স্বামী ডাকাত হয়, নিরীহ ভদ্রলোককে বিপথে নিয়ে গিয়ে যে-সুন্দরী আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়, তাকে কখনো কী এঁরা ক্ষমা করতে পারেন ? তাই সমবেদনার পরিবর্তে নিষ্ঠুরভাবে মাদাম দেরম্যাভিয়ের 'অবিচুয়ারি' লিখলেন তাঁরা। লিখলেন, 'শি ওয়াজ নোন্ টু বি অ্যান হ্যাবিচুয়াল ড্রাঙ্কার্ড, এ প্যারমোর অব সুইণ্ডলার অ্যাণ্ড অ্যাডাল্ট্রেস। আপন দিস কমেন্ট ইজ নিড্লেস।'

অর্থাৎ দুর্বার পানাসক্তি ছিল দেরম্যাভিয়ের। রোজই নাকি সে মদ খেত। তার ওপর সে ছিল এক লম্পটের রক্ষিতা, ভ্রষ্ট-চরিত্রা। সুতরাং এই নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই ভালো।—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

হায় দেরম্যাভিয়ে! বেচারি কী এ জন্য ভালোবেসেছিল অভিনয়কে ? সুদূর সিডনি থেকে হেনরীর হাত ধরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নই কী দেখতে দেখতে সে এসেছিল ?—কী মঞ্চে, কী মঞ্চের বাইরে, সেকালের কলকাতায় অনেক নাটক ঘটে গেছে কিন্তু এমন নিষ্ঠুর নাটকীয় ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। কখনো না।

লোয়ার সার্কুলার রোডের সিমেট্রিতে আজো শুয়ে আছেন এই মহিলা। আজো। তবে এখানে তিনি মাদাম দেরম্যাভিয়ে নন, তিনি ম্যারিয়া ম্যাডলিন টেলর। সমাধির গায়ে লেখা আছে।—

'SACRED TO THE MEMORY
OF
MARIA MADELINE TYLOR
Who died on 13th May, 1841
Aged-27 Years.

সাতাশ বছর বয়সে যে নায়িকা এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল, তার কথা কে মনে রাখে ?—কেউ না। অন্ততঃ ব্যস্ত কলকাতার তা মনে রাখবার সময় কোথায় ?

সাত

মেরিয়ান, আবার মেরিয়ান

'মেরিয়ান, আবার মেরিয়ান!'

অস্ফুট স্বরে এবং প্রায় মনে মনে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন নায়ক। আর নিজের এই স্বগতোক্তিতে নিজেই ভীষণ চমকে উঠলেন। মনে হল, কোনো নিষিদ্ধ কথা যেন তিনি উচ্চারণ করে ফেলেছেন! অকারণে লজ্জায় আরক্ত হলেন।

সেবার সতেরোশ উনসত্তর সাল। 'ডিউক অব গ্রাফ্‌টন' জাহাজটি ভাসতে ভাসতে ভাসতে আসছিল আরব সাগরের ওপর দিয়ে। আসছিল লণ্ডন থেকে ভারতের পথে। সুদীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রায় অবসাদ আসে। ক্লান্তি আসে। বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি হয়ে ওঠে ভীষণ এক ঘেয়ে। 'ডিউক অব গ্রাফ্‌টনে'র যাত্রীদেরও তাই হয়েছিল।—ওয়ারেণ হেস্টিংস নামে যে ভদ্রলোকটি সেবার এই জাহাজে ভারত প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তাঁর অবস্থা ছিল সব থেকে শোচনীয়। সব থেকে করুণ। তিনি ছিলেন একা। একবারে নিঃসঙ্গ।

অবশ্য মনে মনে সাহেব একজন সঙ্গিনী যোগাড় করে নিয়েছিলেন। আর মনে মনেই ভালোবাসার কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন।—কিন্তু মজার ব্যাপার এই, হেস্টিংস সাহেবের এই সঙ্গিনী কিন্তু মোটেই অশরীরী বা কাল্পনিক ছিল না। বরং ছিল অতিরিক্ত রকমের দেহী। এই জাহাজেই সে চলেছিল 'ইণ্ডিজে।' সঙ্গে স্বামী। সঙ্গে তিন বছরের এক শিশুপুত্র। চলেছে ভাগ্য ফেরাতে।

নায়িকা সত্যিসত্যিই নায়িকা। ভারি সুন্দরী। ভারি মিষ্টি। অপরূপ দেহবল্লরী। মেয়েটির সব থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল অপরূপ কেশদাম।—অমন কোঁকরানো চুলের ঢাল হেস্টিংস জীবনে কখনো দেখেন নি। একরাশ সোনালি ঢেউ হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।—চোখ ছুটিও ছিল ভীষণ উজ্জ্বল। একটি আলগা হাসি সর্বদাই মুখে লেগে আছে। চোখে চোখ পড়লে আঠার মত আটকে যায়। তখন চোখ আর ফেরানো যায় না। হেস্টিংসের বার বার তাই হয়েছে। বার বার। মেয়েটি লাজুক হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। সেও চোখে চোখ ফেলেছে। অবশেষে হেস্টিংস বিভ্রান্ত না হয়ে পারেন নি। নিজের অজান্তে ঐ নায়িকাকে কখন যে তিনি মনে মনে ভালো বেসে ফেলেছেন, তা নিজেও টের পেলেন না।

কখনো লাউঞ্জে গল্প গল্প করতে করতে, কখনো-বা ডেকে বেড়াতে বেড়াতে একটু একটু করে ওদের কথা জেনে নিলেন হেস্টিংস।

ওরা জার্মান। স্বামীর নাম হল ক্রিস্টোফার অ্যাডাম কার্ল ভন্ ইমহফ। ব্যরণ পরিবারের ছেলে। সংক্ষেপে, ব্যারণ ইমহফ্। বিয়ের আগে নায়িকার নাম ছিল, আন্না মারিয়া অ্যাপোলোনিয়া। এখন শুধুই শ্রীমতী ইমহফ। তিন বছরের শিশুটির নাম হল চার্লস। ইমহফের পূর্বপুরুষেরা এককালে ছিলেন ফরাসী দেশে। আর পরবর্তীকালে পুরোপুরি ভাবেই জার্মানীর বাসিন্দা।

ক্রিস্টোফার ইমহফ বড়ো ব্যারণ পরিবারের ছেলে হলেও টাকা-পয়সায় তেমন স্বচ্ছল ছিলেন না। তালপুকুরে যেমন ঘটি ডোবে না, তাঁদের অবস্থাও ছিল অনেকটা সেইরকম। তালপুকুর ছিল, কিন্তু ঘটি ডুবতো না।—তা অবস্থা যাই হোক না কেন, সাহেবের কিন্তু একটি বিশেষ গুণ ছিল। সে গুণটি হল ছবি আঁকা। হাতির দাঁতের পাতের ওপর 'মিনিয়েচার পোর্ট্রেট' এঁকে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতেন। স্বদেশে এ ব্যাপারে সাহেবের কিন্তু গুণের কদর হল না। সুতরাং অন্য পেশার কথা অনিবার্যভাবেই ভাবতে হল সাহেবকে। কাজ

করলেন তিনি কিছুদিন জার্মান-ফৌজে। কিন্তু শিল্পী যে লোক, ফৌজী কাজে সে কী সুখ পেতে পারে?—তাই শেষ পর্যন্ত ঐ কাজে ইস্তফা দিয়ে ছবি আঁকাকে পেশা করে সাহেব চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে।

ইংল্যাণ্ডে এসে শুনলেন নতুন দেশ 'ইণ্ডিজের' কথা। 'ইণ্ডিজ' মানে রূপকথার দেশ। এই রূপকথার দেশের আকাশে-বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে টাকা। এ দেশে না কী সবাই রাজা-মহারাজা। কেবল রাজা মহারাজা নয়, রয়েছেন নবাব-সুবাদার প্রমুখ ধনী ব্যক্তিরা। রয়েছেন আমীর-ওমরাহ বা জমিদার-মহাজনেরা। আর যাঁরা সাহেব-নবাব ছিলেন, তাঁদের কথা না তোলাই ভালো। এঁরা টাকা ওড়াতেন নিত্যি নতুন শখে। শৌখীনতার ব্যাপারে কখনো এঁরা কোনো রকম কৃপণতা করতেন না। সুতরাং ছবি আঁকানোর ব্যাপারে এঁরা যে একটু আগ্রহী হবেন, তা অবশ্যই আশা করা যায়।

এই আশাতেই বুক বেঁধে ক্রিস্‌টোফার ইমহফ্‌ পাড়ি দিলেন ভারতে। তবে চাকরি তাঁকে একটা নিতেই হল। এবং এ চাকরি তিনি নিলেন কোমপানির মিলিটারীতে। মিলিটারীর চাকরিতে পয়সা-কড়ির তেমন জোর ছিল না। খাওয়া-থাকা বাবদে যদিও কোনো খরচ লাগত না, কিন্তু তারপরে কোমপানি যা দিত, তা অতি সামান্য। দিত দৈনিক এক টাকা করে মজুরী।—ঐ রোজগারের ওপর ভরসা করে ইউরোপীয় স্ত্রীই প্রতিপালন করা যেত না, আর ভাগ্য ফেরানো?—সে আরও দূর অস্ত। সুতরাং ভাগ্য ফেরাতে হলে এই চাকরিতে ভরসা করা নিতান্তই দুরাশা মাত্র।

ব্যারণ ইম্‌হফ্‌ নিজেও যে এসব জানতেন না, তা নয়। চাকরির ওপর তিনিও খুব একটা ভরসা করেন নি। তাঁর একমাত্র ভরসা ছিল ছবি আঁকার ওপর। এ ব্যাপারে কতখানি কী করতে পারবেন সে সব কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন তিনি। অন্য কিছু না, সারা পথে এটাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্বেগ! অজানা-অচেনা 'ইণ্ডিজে'র ছবি এঁকে চলেছিলেন তিনি মনে মনে।

এমন সময় এই জাহাজে, 'ডিউক অব্ গ্রাফ্‌টিনা'র ডেকে পায়চারি করতে করতে ওয়ারেণ হেস্টিংসের সঙ্গে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই পরিচয় হয়ে গেল ইম্‌হফের। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে। এ পরিচয়ে হাতে চাঁদ পেলেন ব্যারণ ইমহফ্। যে-সে ব্যক্তিকে নয়, ভারতযাত্রায় ওয়ারেণ হেস্টিংসকে সঙ্গী হিসাবে পাওয়া, তখনকার দিনে এ কী কম কথা! উঁচু কপাল, রোগা পাৎলা চেহারার এই লোকটিকে একা একা পায়চারি করতে দেখেছেন ডেকে। দেখেছেন ডেকে-চেয়ারে উদাস হয়ে বসে থাকতে। কখনো দেখেছেন লাউঞ্জে বসে একমনে জার্নালের পাতা ওল্টাতে। আবার কখনো দেখেছেন ডাইনিং টেবিলে একাকী, উদাসীন, অন্যমন। কারো সঙ্গে গল্প করছেন, এমন দৃশ্য ইমহফ্ একবারেও দেখেন নি।

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং নানাদামী লোকেরাই সাধারনত এরকম ঘোরাফেরা করেন। তাই প্রথম থেকেই ক্রিস্‌টোফার ইমহফের সন্দেহ ছিল যে ইনি একটা 'কেষ্ট-বিষ্টু' না হয়ে যান না। এক আধবার একান্তে স্ত্রীকেও এ সন্দেহের কথা জানিয়ে বলেছিলেন, 'ডার্লিং, আমার ধারণা উনি একজন ইম্‌পর্টেনট্ ম্যান। ওঁর সঙ্গে আমাদের একটু আলাপ করা উচিত।'

স্বামীর এইসব কথা শুনে শ্রীমতী ইম্‌হফ্ একটু হেসেছিল, তারপর মৃদু সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, 'চেষ্টা করো আলাপ করতে। সম্ভবত উনি আমাদের বন্ধু হবেন।' এরপরে আবার একটু হেসেছিল মাদাম ইম্‌হফ্। তাৎপর্যপূর্ণ হাসি। ব্যারণ অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'হাসছ কেন?'

'এমনি!'

'ও! আমাকে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না! দেখো তুমি, উনি নিশ্চয়ই একজন ভি. আই. পি।'

ঐ 'ভি. আই. পি'-কে আবিষ্কার করে রাজ্য-জয়ের আনন্দ নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কেবিনে চলে এলেন ব্যারণ সাহেব। তারপর স্ত্রীর

কাছে এসে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'ডার্লিং শেষ পর্যন্ত আমারই হল ভিক্‌ট্রি। ঐ লোকটি কে জানো? উনি আর কেউ নন, স্বয়ং ওয়ারেণ হেস্টিংস!'

'হ্যাট ফেমাস ওয়ারেণ হেস্টিংস!—সত্যি?'

ব্যারণ বললেন 'শুধু সত্যি নয়, ভীষণ ভাবে সত্যি। উনিও আমাদের মতন চলেছেন ম্যাড্রাস। তবে আমার মত বাজে চাকরি নিয়ে নয়। উনি চলেছেন বিরাট এসাইন্‌মেন্‌ট্‌ নিয়ে। কাউনসিলে ওঁর পোজিসন হবে সেকেণ্ড।'

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। দেখতে দেখতে এই সমুদ্রযাত্রায় ইম্‌হফ পরিবারের সঙ্গে হেস্টিংসের সম্বন্ধ হয়ে উঠল খুবই ঘনিষ্ঠ। খুবই নিবিড়। খাবার টেবিলে, জাহাজের ডেকে, বা লাউঞ্জের চেয়ারে হেস্টিংসকে আর কোনো সময়ের জন্যই দেখা গেল না একা। সর্বদাই এঁর সঙ্গী হিসাবে রইলেন ইমহফ পরিবার।—কখনো কখনো দেখা গেল শ্রীমতী একাই সঙ্গ দিতে থাকলেন ওয়ারেণ হেস্টিংসকে।

আর হেস্টিংস! তাঁর স্বপ্ন দেখাও ঠিক এখন থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল। দুটি নিবিড় নীল চোখ আচ্ছন্ন করল তাঁকে! অপূর্ব কুঞ্চিত কেশদাম এবং তরুণী বধূর অপরূপ দেহশ্রী ধীরে ধীরে নেশা ধরিয়ে দিল ওয়ারেণ হেস্টিংসের মনে। জীবন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, ঝঞ্ঝা তাড়িত একটি মানুষ নিজের অজান্তেই পথ হারালেন যৌবনের বনে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সেও মনে নতুন করে আবার রঙ লাগল। —ম্যাড্রাস কাউনসিলের দু নম্বর সদস্য নিজের ভেতর আরেকটি মানুষকে আবিষ্কার করে বার বার বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

'অক্‌সফোর্ডশায়ারের ভেতর ছোট্ট একটি গ্রাম, 'চার্চিল'। সেখানে আমার জন্ম হয়েছিল। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ডিসেম্বরে আমার জন্ম। আমার মা, যাঁর কুমারী নাম ছিল 'ওয়ারেণ', তিনি দেহ ত্যাগ করলেন আঁতুড়ে। আমার বয়স যখন নয় মাস, আমার বাবা আমাকে ত্যাগ

করে চলে যান 'বারবাডোসে' একটি জীবিকার অধিকার নিতে। এই ঘটনার বারো বছর পরে তিনি ত্যাগ করলেন ইহলোক। আমার জীবনের প্রথম সাত-আট বছর এখানে এবং 'ডেলসফোর্ডে' হল অতিবাহিত। 'ডেল্‌সফোর্ডে' ছিল আমার ঠাকুরদার বসবাস। বছর পাঁচ বয়সে আমার হল স্মল-পক্‌স। ১৭৪০ সালে আমাকে নিয়ে আসা হল সহরে। কিছুকাল থাকবার পর পাঠানো হল আমাকে স্কুলে। ...প্রায় বছর তুই এখানে থাকলাম। আঠারোশ বিয়াল্লিশে সে স্কুল ছেড়ে এলাম ওয়েস্‌ট্‌মিনিস্‌টারে।...সতেরোশ উনপঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেঠা মারা গেলেন।...সতেরোশ পঞ্চাশের জানুয়ারীতে আঠারো বছর বয়সে লণ্ডন থেকে তাগ করলাম ইংলণ্ড। অক্টোবর মাসে হাজির হলাম এসে কলকাতায়।'

পরবর্তীকালে যিনি ভারতভাগ্যবিধাতা হয়ে দেখা দিলেন, নিজের সম্পর্কে এ রকম ছেঁড়া ছেঁড়া স্মৃতি তাঁর প্রায়ই মনে আসত। মাঝে মাঝেই তিনি ভাবতে বসতেন নিজেকে নিয়ে। ভাবতেন নানা কথা, বিশেষতঃ নিজের ভগ্যের কথা। ইংল্যাণ্ডের এক বনেদী পরিবারেই জন্ম হয়েছিল তাঁর। বেশ বনেদী পরিবার, জমিদার বংশ। পুরনো দিনে এ পরিবারের খুবই রমরমা ছিল, তবে জন্মের পর থেকে হেস্টিংস দেখলেন অবস্থা 'পড়ো-পড়ো'। একটু একটু করে সবই চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে জমি জিরেত যা ছিল, তাও গেল। শেষ বেশ ভদ্রাসনটুকুও দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল। জ্যেঠা হাওয়ার্ড হেস্টিংসের আশ্রয়ে সহরে এল ভাইপো। জ্যেঠা কাজ করতেন 'কাস্‌টম্‌সে'। পরে ইনি বদলি হয়ে এলেন খোদ সহর লণ্ডনে। এসে পাবলিক স্কুল ওয়েস্‌টমিনিসটারে ইনি ভাইপোকে দিলেন ভর্তি করে। পুরনো স্কুল-রেজিষ্টার খুললে দেখা যাবে এদিনের তারিখ, মে ২৭, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৩।

কী বিদ্যায় কী বুদ্ধিতে যাচাই করলে দেখা যায় ঐ কিশোর ওয়ারেণ কারোর থেকে কম ছিল না একরত্তি। ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে এর অনুরাগ ছিল গভীর। গ্রীক লাটিন ভালই ঢুকত এর

মাথায়। ক্লাসিক্সের ভালো ছাত্র হিসাবে ওয়েস্টমিনিস্টারে এ খ্যাতি পড়ল ছড়িয়ে। লেখাপড়ায় সে স্কুলের অন্যতম সেরা ছাত্র। ক্লাসের একবারে ফার্স্ট বয়। হেস্টিংসের অনেক সহপাঠী যাঁরা বুদ্ধি ও বিদ্যায় তার থেকে অনেক কম ছিল, তাঁরা পরবর্তী কালে কর্মক্ষেত্রে বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সুতরাং লেখাপড়া চালিয়ে গেলে ওয়ারেণ হেস্টিংস যে নিজেই বিরাট হতে পারতেন তাতে আর সংশয়ের কী! সতেরোশ সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে মে প্রতিভাবান এই কিশোরটি 'কিংস্ স্কলার' হিসাবে চিহ্নিত হলেন। ওয়ারেণ হেস্টিংস্ই সম্ভবত এ গৌরবের প্রথম অধিকারী।

কিন্তু কে জানত এই অমিত প্রতিভাধর বালকটির সারস্বত সাধনা ছেদ পড়বে অসময়ে! কে জানত ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে যার অনুরাগ গভীর, গ্রীক ও ল্যাটিনে যার অভাবিত পারদর্শিতা, তাকে পড়াশোনার ব্যাপারে ইস্তফা দিয়ে ইসট্ ইণ্ডিয়া কোমপানির অধীনে অতি তুচ্ছ একটি চাকরি যোগাড় করে যেতে হবে সুদূর কলকাতায়। জন্ম লগ্ন থেকেই যে-শিশু দৈব-লাঞ্ছিত, সেই দৈবই যে তাকে শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়া করবে, তা নতুন কোন কথা নয়। তিনি যে শাখা অবলম্বন করে বাঁচতে চান, দেখতে দেখতে সে শাখা শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। ভেঙে পড়ে।

ওয়ারেণ হেস্টিংসের বয়স যখন ষোল, সেই সতেরোশ আটচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে, জ্যেঠা হাওয়ার্ড হেস্টিংস্ হঠাৎ দুমকরে মারা গেলেন। আর বছর পাঁচ-সাত জ্যেঠা যদি বেঁচে থাকতেন, হেস্টিংসের জীবন তা হলে অন্যরকম হত। কিন্তু জ্যেঠার মৃত্যু তার জীবনকে করে দিল আরেক রকম। জ্যেঠার আশ্রয় নষ্ট হয়ে যাবার পর, চিস্উইক নামে ঠাকুরমার তরফের এক আত্মীয় কিশোর ওয়ারেণকে তাঁর সংসারে এনে রাখলেন। এই চিস্উইকের বিষয়-বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার এবং সেকালের ইসট্ ইণ্ডিয়া কোমপানির সঙ্গে একটু বেশ চেনা জানাও ছিল। হেক্সামিটার পেনটা-মিটার-এর পিছনে ওয়ারেণ হেস্টিংসের সময় নষ্ট করতে না দিয়ে এই নতুন

অভিভাবক কোমপানির অধীনে কিশোর বালকের একটি চাকরি যোগাড় করে দিলেন। না-কোন উজির-নাজিরের চাকরি নয়, সমান্য একটি 'রাইটারের' চাকরি। তবু এই চাকরির জোরেই সেকালে এস্‌পার-ওস্‌পার হতে পারত। যাঁরা দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় তাঁরা এরকম ভাবেই 'ইণ্ডিজে'র পথে বেরিয়ে পড়তেন। তারপর এই 'ইণ্ডিজে' এসে প্রতিকূল জল-হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতে 'লিভারের' অসুখ বাধিয়ে মারা যেত, নতুবা বেঁচে থাকলে সম্পদ ও বৈভবের প্রাচুর্য নিয়ে দেশে ফিরত। সাহেবদের জবানীতেই এঁদের সম্পর্ক বলতে হয়,—'হোয়েদার দি ইয়ং অ্যাডভেঞ্চারের বেড ফরচুন অর ডায়েড অব এ লিভার কমপ্লেন্।'

পরের গলগ্রহ হয়ে থাকাতে তরুণ ওয়ারেণ হেস্টিংস্ মনের দিক থেকে কোন সায় পেলেন না। তাই আত্মীয় চিস্‌উইককে ভারমুক্ত করিতে বেছে নিলেন তিনি দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর পথ। চিস্‌উইকও খুব খুশি হলেন। 'ওয়ারেণ হেস্টিংস এখন আর কারো আশ্রিত নয়, আঠারো বছরের যুবক ওয়ারেণ এখন স্বাধীন', এ সব কথা ওয়ারেণের ভাবতে ভালোই লাগল।

সতেরোশ পঞ্চাশ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জাহাজে চাপলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস।—পুরো ছয়মাস জাহাজেই কাটল। আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে, আরবদেশ গুলির কোল দিয়ে, দক্ষিণ ভারতকেও প্রায় পরিক্রমা করে অবশেষ আঠারো বছরের যুবক এসে পৌঁছুলেন আমাদের এই সহর কলকাতায়। সহর কলকাতায় তখন শরৎকাল। দীঘিতে দীঘিতে তখন পদ্মফুল ফুটেছে। বর্ষার পর গঙ্গা তখন কানায় কানায় ভরা। শিউলির গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস ভারি। গাছের তলা বিছিয়ে থাকে অজস্র বকুল। কলকাতার মাথার ওপর সেদিন নির্মেঘ নীল আকাশ, সন্ধ্যা হলেই সোনার থালার মতন চাঁদ দেখা দেয় আকাশে। শরতের এইরকম এক অপরাহ্নে পাইনাস্টোন হেস্টিংসের পুত্র ওয়ারেণ হেস্টিংস 'কুলপি'তে নেমে বাকিপথ 'কান্‌ট্রিবোটে'

পাড়িদিয়ে কলকাতার ঘাটে এসে নামলেন। না, এঁর আগমনকে স্বাগত জানাতে কোনো তোপধ্বনি হল না। জন কোমপানির এক অখ্যাত 'রাইটার'কে কে চেনে? তার জন্য আবার তোপধ্বনি!

ওয়ারেণ যখন সহর কলকাতাকে প্রথম দেখেন, তখন সহর কলকাত নিতান্তই এক ছোট সহর। মারাঠা-ডিচ খনন করে কলকাতার সীম ঠিক করা হয়েছে। সাহেব পাড়াকে আলাদা করবার জন্য ঘেরা হয়েছে রেলিং দিয়ে। অবশ্য এ সবই হয়েছিল মারাঠা দস্যুরা যাতে অতর্কিতে ঢুকে না পড়ে, তার জন্য। কলকাতার বাহিরে চারদিকে সেদিন বেপরোয়া লুঠতরাজ চলছে, শাসকদের উদ্ধত অন্যায়ে সাধারণ মানুষের তখন ধন প্রাণ ছিল বিপন্ন, কে কখন কেড়ে নেয়, তার ঠিক নেই। এরই ভিতর একটি ছোট্ট দ্বীপের মতন সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা দিয়ে ভাসছিল সহর কলকাতা। অরাজকতার মহাসমুদ্রে সত্যসত্যই তখন সে ছোট্ট একটি দ্বীপ! বা অন্য উপমা দিয়েও বলা যায়, সে মায়ের কোলে ছোট একটি প্রদীপ, কখন নিভে যায় তার ঠিক ছিল না।

রাইটার ওয়ারেণ হেস্টিংসের তখন বার্ষিক মাইনে মোটে পাঁচ পাউণ্ড। টাকার হিসাবে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। অবশ্য এ মাইনে কিন্তু সব নয়। খাওয়া পরা আর হাতখরচ বাবদে রাইটাররা মাসে মাসে আরো গোটা পঁচিশেক করে টাকা পেতেন। ওয়ারেণ হেস্টিংসও পেতেন।

চাঁদপাল ঘাটে নামবার পর থেকে পাকা বছর দুই আড়াই সাহেব কলকাতাতেই ছিলেন। কেরানীর কাজে বহাল থাকলেও ওয়ারেণের চোখ দুটি ছিল খোলা। কোমপানির কাজের ধারা বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধা হত না। ওদিকে বাইরের খবরেও কান রাখতে হত। এই কলকাতাতে থাকতে থাকতেই ওয়ারেণ হেস্টিংস নাম শোনেন ক্লাইব সাহেবের। দক্ষিণ ভারতে আর্কটের যুদ্ধ জয় করে ক্লাইব তখন ইংরেজদের কুঠিতে কুঠিতে রীতিমত চাঞ্চল্য এনেছেন। কলকাতাতে থাকতে থাকতেই ওয়ারেণ হেস্টিংস দেখলেন যে নবাব আলীবর্দী চৌথ দেবার কড়ারে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। গোটা ওড়িশা প্রদেশ

এর ফলে নবাবের হাত ছাড়া হয়ে গেল। এদিকে কলকাতার কাউন্‌সিলেও অনেক পরিবর্ত্তন হল। ওয়ারেণ হেস্টিংস যখন কলকাতায় পা দিলেন, তখন অ্যাডাম ডসন ছিলেন এখানকার প্রেসিডেন্‌ট। তারপর একে একে প্রেসিডেন্‌ট হলেন উইলিঅম ফিট্‌স্‌ ও রোজার ড্রেক। তরুণ ওয়ারেণ হেস্টিংসের এই সব দেখতে বেশ মজাই লাগত। বাঙ্‌লাদেশের প্রকৃতি যেমন ছিল নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এখানকার শক্তি সাম্য ছিল অনেকটা সেইরকম। এখানকার লোকেদের পোশাক আশাক, জীবন ধারনের প্রণালী, উৎসব-আনন্দ এবং সর্বোপরি বুকভরা আতিথেয়তা বেশ ভালই লাগত সাহেব হেস্টিংসের। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক হেস্টিংস গেল হারিয়ে, জন্ম হল তার ভেতরে আরেক মানুষের। গ্রীক লাটিনের অনুরাগী ও ওয়েসট্‌মিনিসটারের সেরা ছাত্র ওয়ারেণ হেস্টিংসকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পরিবর্তে আমরা পেলাম সওদাগর ওয়ারেণ হেস্টিংসকে।

সওদার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য এই তরুণ রাইটারকে কাশিমবাজার কুঠিতে পাঠানো হল সতেরোশ তিপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দে। এই কাশিমবাজার জীবন সাহেবের জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়। ওয়ারেণ হেস্টিংস যখন এখানে এলেন, তখন তাঁর বয়স সবে একুশ। এই বয়সে সমস্ত পৃথিবীকেই রমনীয় মনে হয়। সুতরাং কাশিমবাজার যে অতিসহজে আমাদের সাহেবের মনোহরণ করবে, তাতে আর বিস্ময়ের কী! গঙ্গার কোলেই ইংরেজদের ফ্যাকটারি, অর্থাৎ কুঠি। ছবির মতন সুন্দর জায়গাটি। চারদিক দেখে ভারি ভালো লাগল ওয়ারেণ হেস্টিংসের।

নিম্নবঙ্গে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজারের খ্যাতি অনেক কাল আগে থাকতেই ছিল। এমন কী মুর্শিদাবাদ যখন বাঙ্‌লার রাজধানী হয়নি, তখন থেকেই কাশিমবাজারের প্রসিদ্ধি। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুটান নামে জনৈক এক ইউরোপীয় এই নগরটিকে রেশম আর মসলিনের প্রধান বন্দর বলে অভিহিত করেছিলেন। এখানে যে একদা ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির অনেক কুঠি ছিল, তা তাঁর বিবরণ থেকেই জানা

যায়। বার্ণিয়ের ও টেভারনিয়ের দু জনেই একদা এখানে এসেছিলেন। ষোলশ আটান্ন খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক চল্লিশ পাউণ্ডের মাইনেতে এখানকার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ হলেন জন কেন্ নামে এক ইংরেজ সাহেব। এই কুঠিয়াল সাহেবের সহকারী নিযুক্ত হয়েছিল জব চার্ণক। সেই চার্ণক, যিনি কলকাতার প্রতিষ্ঠা করেন। ষোলশ আশিতে চার্ণক সাহেব কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ হলেন। এরপরে একে একে অনেক অঘটন ঘটে যায়, অনেক ঝড় বয়ে যায় কুঠিয়াল ইংরেজদের ওপর দিয়ে। সে অনেক ঝড়। অনেক।

কাশিমবাজারে আসবার আগেই ওয়ারেণ হেস্টিংস এসব বিবরণ শুনেছিলেন।

এই সব শুনতে শুনতে এবং চারিদিক দেখতে দেখতে ওয়ারেণ হেস্টিংসের মনে হত সেই রকম ঝড় আবার উঠবে। চোখ বুজলেই সাহেব তাঁর শাঁ-শাঁ শব্দ শুনতে পেতেন।

কাশিমবাজার বেশ ভালোই লাগল তরুণ ওয়ারেণের। পদ্মা-ভাগীরথী আর জলঙ্গীর মধ্যবর্তী ত্রিকোণ জমি সত্যি সত্যিই সুন্দর। পৃথিবীর এমন দূরদেশ যে কখনো দেখতে হবে, তা ছাত্র ওয়ারেণ কখনো ভাবেননি। কখনো না। অথচ এ দেশ দেখতে তাঁর ভালোই লাগছে। কী সুন্দর রেশম আর মসলিন। ইউরোপের লোকেরা এ রকম জিনিষ জীবনে কখনো দেখেনি।

এখানে আসবার কিছুদিনের ভেতরেই এক নেটিব যুবকের সঙ্গে তাঁর ভারি ভাব হয়ে গেল, যুবকটির নাম কৃষ্ণকান্ত পান্তি। বেশ চালাক-চতুর ছোকরা। আর ছোকরা ভারি মিশুকে। সকলে তাকে 'কান্ত' বলেই ডাকত। পান্তির বাবার নাম রাধাকৃষ্ণ। বংশানুক্রমে এঁদের ছিল রেশম আর সুপুরির ব্যবসা। কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি আর রেসিডেন্সের কাছেই এঁদের কারবার। কুঠির লোকেদের সঙ্গে গলায় গলায় মেলামেশা। কান্ত পান্তি ভালোই বাঙলা জানতেন, জানতেন ফারসীও। আর এই ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে মেলামেশার

ফলে কিছু ইংরেজিও শিখে নিয়ে ছিলেন। কান্তপান্তির শব্দভাণ্ডারে হাজার দুই ইংরাজী শব্দ অন্তত জমা ছিল। ওয়ারেণ হেস্টিংস্ প্রমুখ কুঠিয়ালদের সঙ্গে কথা বলবার সময় এগুলিকে তিনি একবার করে ঝালিয়ে নিতেন। আর চমকিত করে দিতেন এই শব্দগুলির ব্যবহার দেখিয়ে।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে রেশম আর মসলিন কেনা হত বেশি করে। এই রেশম কেনার ব্যপারে কান্তের দক্ষতা দেখে ইংরেজরা তাকে নিজেদের কুঠিতেই দিল একটি চাকরি। প্রথমে মুহুরির চাকরি, পরে পদোন্নতি হল।—আর ঠিক সেই সময় থেকেই ওয়ারেণ হেস্টিংসের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়।

এই কান্তকে নিয়ে গল্প করে অনেক অবকাশ কাটিয়েছেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। উৎকৃষ্ট রেশমী কাপড় এবং সূক্ষ্ম মসলিন সওদা করতে করতে এঁরা ঘুরে বেরিয়েছেন অনেক। সমৃদ্ধ কাশিমবাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন একুশ বছরের এই ইংরেজ কুঠিয়াল। প্রাসাদের পর প্রাসাদ। এত প্রাসাদ যে গণনা করে শেষ করা হায় না। পাঁচ-ছয় মাইল জুড়ে এরকম কেবল বাড়ি আর বাড়ি। এক বাড়ির ছাদে উঠলে ছাদে ছাদে গোটা সহরটা ঘুরে আসা যায়। খোদ লণ্ডনেও এমন সমৃদ্ধ সৌধরাশি ছিল না বললেই হয়।

কুঠির কাজ শিখে নিতে ওয়ারেণ হেস্টিংসের বেশিদিন লাগল না। অতি তাড়াতাড়ি একাজে তিনি পাকাপোক্ত হয়ে উঠলেন। মফস্বল ঘুরে ঘুরে মাল সওদা করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে কুঠিতে ফিরে আসতেন। নদীর ধারের ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুম নামত দু চোখ ভারি করে। আর ঠিক সেই সময়েই তিনি শাঁ শাঁ শব্দটা শুনতে পেতেন। মনে হত অনেক অশ্বারোহী সৈনিক দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। তাদের ক্ষুরধ্বনি অনেকক্ষণ কানে বাজত। অনেকক্ষণ।—ওয়ারেণ হেস্টিংসের মনে হত ঝড় উঠবে।

কাজে দক্ষতা দেখানোর ফলে ওয়ারেণ হেস্টিংস এদিকে অতি অল্প

সময়ের ভেতর কাশিমবাজার কাউন্সিলের একজন মেম্বার হয়ে গেলেন। খবরটি অবশ্যই শুভ এবং সুখের, তবে এ সুখ ওয়ারেণের ভাগ্যে বেশি দিন সহ্য হল না। চোখ বুজলে মাঝে মাঝে সাহেব যে-ঝড়ের শব্দ শুনতে পেতেন। শেষ পর্যন্ত সেই ঝড় সত্যি সত্যিই একদিন উঠল। মুর্শিদাবাদের মসনদে আলিবর্দীর পরে বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। আর মসনদে বসবার পর থেকেই সিরাজ তেড়েফুঁড়ে লেগে পড়লেন ইংরেজদের এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য।

সতেরোশ ছাপ্পান্নতে সিরাজ লুঠ করলেন ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি। ওয়াট্‌স্ সাহেব ছিলেন কুঠির অধ্যক্ষ। কলেট ও ব্যাটসন ছিলেন দুজন সদস্য। এঁরা সকলেই কুঠিতে ছিলেন। এঁদের সকলকে বেঁধে নবাব বাহাদুর চালান দিলেন মুর্শিদাবাদে। ঠিক এই সময় উত্তর বঙ্গের এক আড়তে বসে রেশমের থান কিনছিলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। প্রথম ধাক্কাটা তাই তাঁকে খেতে হল না। তবে পরে তাঁকে নবাবের লোকদের হাতে পড়তে হল। কিন্তু নিগ্রহ তেমন কিছু হল না। কালিকাপুরের ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ভিনেট সাহেব ওয়ারেণ হেস্টিংসের হয়ে জামিন থাকলেন নবাবের কাছে।

এদিকে ইংরেজরা তখন কলকাতা থেকে নবাবের তাড়া খেয়ে ফলতায় গিয়ে বসে আছে। তাদের সঙ্গে গোপন যোগসূত্র রাখা অবশ্যই দরকার। সেই যোগসূত্র রাখতে গিয়েই নবাবের আবার সন্দেহ ভাজন হলেন ওয়ারেণ। আর তারপরই পালাতে হল তাঁকে বন্দীত্ব এড়াবার জন্য। এই সময় পালাতে পালাতে তাঁকে একবার আসতে হয়েছিল কাশিমবাজারে। নবাবের গুপ্তচরদের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করলেন কৃষ্ণ কান্ত পান্তির। অর্থাৎ সেই কান্তবাবুর। কান্তর বুকের পাটা ছিল। শিকারী নেকড়ের মতন চারদিকে নবাবের অনুচরেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে ওয়ারেণ হেস্টিংসকে। তাদের দেখে একটুও ভীত হলেন না কান্ত। যা সম্বল ছিল, তাই দিয়েই অতিথি-সৎকার করলেন। কলাগাছ থেকে কলার পাতা কেটে

এনে সাহেবকে তারওপর খেতে দিলেন পান্তাভাত, চিংড়ি মাছ, বড়ি পোড়া, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদি। ওয়ারেণ হেস্টিংসের এই দুঃসময়ের স্মৃতি রসিক বাঙালি কবিরা ধরে রেখে দিয়েছিলেন সুদীর্ঘকাল,—

হেস্টিংস সিরাজভয়ে হয়ে মহাভীত
কাশীমবাজারে গিয়া হন উপনীত।
কোন স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়
হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।
কান্তমুদী ছিল তাঁর পূর্ব পরিচিত
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান
দেখিতে না পেয়ে রোষে করিল প্রস্থান।
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়
হেস্টিংসে কি খেতে দিয়ে প্রাণ রাখা যায়?
ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলা গাছ।
সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগণে
হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে।

ওয়ারেণ হেস্টিংসের জীবনে বিপর্যয় এসেছে একাধিক বার। কিন্তু এরকম জীবন সংশয়কর পরিস্থিতি কখনো আসেনি। দুর্দিনের বন্ধুদের হেস্টিংস সারা জীবন মনে রাখতেন। সারা জীবন। ভিনেট সাহেব থেকে কান্তপান্তি সকলেই ভারতসম্রাট ওয়ারেণ হেস্টিংসের তাই স্মরণে ছিলেন। অনুগ্রহও পেয়েছিলেন।

এরপর কান্তবাবুর বাড়িতে ডিনার শেষ করে ওয়ারেণ পালিয়ে গেলেন ফলতায়। সিরাজের কলকাতা বিজয়ের পর বাঙ্‌লা মুলুকের

ইংরেজরা সেদিন মিলিত হয়েছে ঐ ওখানে। মেয়ে-পুরুষ, কাচ্ছা-বাচ্ছা সবাই সেখানে হাজির।—সকলের চিত্তই দুঃখ ভারে ভারাক্রান্ত। টাকা-কড়ি ধন সম্পদ যার যা ছিল, সবই গেছে। আত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় কারো বা মন ভারি। ভীষণ অনিশ্চয়তার ভেতর সকলের দিন কাটছে।—এদিকে গ্রীষ্মের আকাশে মাঝে মাঝে ঝড় উঠছে এলো মেলো। মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে মেঘ। এক আধ পশলা বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে মুষল ধারে।—অসহায় ইংরেজকুল দিন কাটাচ্ছেন ভীষণ অসহায় ভাবে। প্রকৃতি যেন তাঁদের ভাগ্যের প্রতীক।

চব্বিশ বছরের তরুণ ওয়ারেণ হেস্টিংস হঠাৎ এই ফলতায় একটা কাণ্ড করে ফেললেন।—সদ্য প্রতিবিয়োগে শোকাতুরা এক বিধবা মহিলাকে তিনি ঝুম্ করে বিয়ে করে বসলেন। বিধবার নাম, মেরি। সঙ্গে দুটি কন্যা। মেরির স্বামী ছিলেন কোম্পানির ফৌজে ক্যাপটেন। পুরো নাম, ক্যাপটেন জন বুকানন। হলওয়েল সাহেবের মত উনিও অন্ধকূপে আবদ্ধ ছিলেন। হলওয়েল সাহেব বেঁচে গিয়েছিলেন বটে, ইনি কিন্তু বাঁচেন নি। দুটি শিশু কন্যাকে অসহায় করে এবং মেরিকে বিধবা করে ইনি মারা গেলেন।

দুটি কন্যার জননী মেরিকে বিয়ে করে ফেললেন চব্বিশ বছরের যুবক ওয়ারেণ হেস্টিংস।

বয়সের হিসাব করলে দেখা যায়, এই বরের থেকে কনে একটু বড়োই ছিলেন। তা মেরি বড়ো হোন, হেস্টিংস সাহেবের এতে কোন অসুবিধা হয় নি। না মনের দিক থেকে, না প্রেম ভালবাসার দিক থেকে। মেরির মেয়ে দুটিকে ভালোই লাগত ওয়ারেণ হেস্টিংসের। আহা! অসহায় দুটি মেয়ে। এদের ভরণ-পোষণ ও মানুষ করবার দায়িত্বভার সানন্দে ওয়ারেণ হেস্টিংস তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।

এ সময় কিছুদিনের জন্য বাঙ্‌লা দেশের আকাশ-বাতাস ছিল বারুদের গন্ধে ভারি। মনে হয়েছিল অনেক গোলাগুলি বুঝি ফুটবে। না, তেমন কোনো দীর্ঘস্থায়ী ঘটনা ঘটল না। পলাশীর মাঠে লড়াই-লড়াই একটু

খেলা হবার পরেই পরিস্থিতিটি গোটাগুটি ইংরেজদের অনুকূলে চলে এলো। আর এর ভেতরেই যুবক ওয়ারেণ হেস্টিংস বধূ মেরির কোলে দেখলেন নতুন ছেলের মুখ। চাঁদের মত ছেলের মুখ। আদর করে এই ছেলের নাম রাখা হল, জর্জ। সতেরোশ সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দের পয়লা ডিসেম্বর তার জন্ম।—পলাশী বিজয়ের গৌরবে আমাদের গরবিণী কলকাতা আবার গৌরবান্বিতা হলেন হেস্টিংস-সন্তানের জন্ম দিয়ে।

এদিকে পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে থেকেই ওয়ারেণ হেস্টিংসের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছিল একটু একটু করে। ক্লাসিক্‌সের তুখোড় ছেলে ওয়ারেণ বরাবর নানা ভাষা শিক্ষায় ছিলেন ভীষণ উৎসাহী। ভেতরে ভেতরে সকলের অজান্তে ফারসী ভাষাটা তিনি ভালোই শিখে ফেলেছিলেন। ভালোই। এজন্য একসময় মুসলমান মৌলবী রেখেছিলেন বলেও শোনা যায়। এদিকে কূটনীতি ও দূতকার্যেও তিনি রীতিমত দক্ষতা অর্জন করে ফেললেন। সুতরাং—

সুতরাং এরকম লোক যে সকলকে ছাপিয়ে ওপরে উঠবেন, তা কী আর বলবার অপেক্ষা রাখে?—একবার কূটনীতির চাল দিতে গিয়ে গড় গড় করে ফারসী আউড়ে কী ইংরেজ, কী নবাবের লোক—সকলকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। তাই পলাশীর যুদ্ধের পর এমন লোকের উন্নতি হবে নাত, কার হবে?—হলোও তাই! ক্লাইব সাহেব তখন মাথা। তাঁর সুনজরে পড়েগেলেন ওয়ারেণ। আবার এলো কাশিম বাজারে।···সেই কাশিমবাজার।···সেই কুঠি।···তবে একজন নগণ্য রাইটার হিসাবে নয়। এলেন কাউনসিলের সদস্য হিসাবে। তুনম্বর সদস্য।

কয়েক মাসের ভেতরে মুর্শিদাবাদের রেসিডেনট্‌ও হয়ে গেলেন। সতেরোশ সাতান্নর শেষ থেকে ষাট—এই তিন বছরেরও কিছু বেশী সময় ওয়ারেণ হেস্টিংসকে কাটাতে হয়েছিল কাশিমবাজারে।—এ সময়টা ভারি সুখের ছিল তাঁর। ভারি সুখের। সুখে ও সচ্ছলতায় সংসারটি ছিল উচ্ছল। সুগৃহিনী মেরির ছোঁয়ায় সব গিয়েছিল সোনা হয়ে।

মাঝে মাঝে ওয়ারেণ হেস্টিংস নিমন্ত্রণ করতেন তাঁর সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবদের। আদব-আপ্যায়নে তাঁর সুখের ছোঁয়া এঁদের দিতেন। এই আপ্যায়নের একদা সাক্ষী ছিলেন 'বেচার' নামে এক সাহেব। এঁর অসুস্থ স্ত্রীকে সুস্থ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হেস্টিংস সাহেব। স্ত্রী মেরির সেবার ওপর ভরসা করেই অন্তত এসব কথা তিনি বলতে পেরেছিলেন। কাশিমবাজার যে মিসেস্ বেচারের ভালো লাগবে, তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হেস্টিংস একটি চিঠি পাঠিয়ে লিখেছিলেন, '...নাথিং উইল বি ওয়ানটিং অন্ হার পার্ট টু রেনডার দি প্লেস এগ্রিয়েব্‌ল টু হার।'

মেরির ভালোবাসায় ওয়ারেণ হেস্টিংস যে তৃপ্ত, আপ্লুত এবং পরিপূর্ণ সুখী, একথা আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব প্রায় সকলকেই দিয়েছিলেন জানিয়ে। আজন্ম অনাদৃত ওয়ারেণ হেস্টিংসের বেশ কয়েকটি সুখের মাস কেটে গেল। যে চিসউইকের কাছ থেকে শেষ বারের মত চলে এসেছিলেন আঠারো বছরের তরুণ হেস্টিংস, তাঁকে চিঠি লিখে এই সুখের কথা জানতে ভোলেন নি কাশিমবাজারের এই সুখী মানুষটি। প্রথম চিঠিতে জানিয়েছিলেন বিয়ের সংবাদ, পরের চিঠিতে জানালেন দাম্পত্য সুখের খবর। এই সুখের কথাটিতে জোর দিয়ে লিখলেন, 'আই ক্যান্ নাউ উইথ মাচ্ গ্রেটার কন্‌ফিডেন্‌স রিপিট্ ইট'। অর্থাৎ এখন আমি আরো গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে পুনরুক্ত করছি। শেষে লিখেলেন স্বাদের কথা, অনুভবের কথা। লিখলেন, 'এক্‌সপিরিয়েন্‌সড্ এভ্‌রি গুড কোয়ালিটি ইন্ মাই ওয়াইফ হুইচ আই অলওয়েজ মোস্‌ট উইশ্‌ড ফর ইন্ এ উওম্যান।' অর্থাৎ 'একজন স্ত্রীলোকের কাছে আমি সর্বদা যা পেতে আশা করি, ইচ্ছা করি, তার সবগুলিই আমার সর্বগুণান্বিতা বধূর ভেতর আস্বাদ করলাম!'

বধূর কাছে স্ত্রীর কাছে পুরুষ যা পেতে ইচ্ছা করে এবং পেলে তুষ্ট হয়, আমাদের নায়ক ওয়ারেণ হেস্টিংস্ তার সবই পেয়েছিলেন। সব। মৃত জন বুকাননের কোনো স্মৃতি এঁদের মিলনকে কোনো দিনের জন্য

ব্যথিত করে নি। বরের থেকে কনের বয়স যে বেশি, তাও কোনোদিন দুজনের কাছে বাধা মনে হয় নি। বাঙলা দেশের বেশ কয়েকটি ঋতু এঁদের সুখেই রেখেছিল।

কিন্তু যার কপালে বিধাতা পুরুষ সুখ লেখেন নি, তার কী কখনও সুখ হয়! সুদূর ইংলণ্ড থেকে হেস্টিংস যখন এদেশে আসেন, তখন এ কথাটাই মনে ছিল—হয় লিভারের অসুখ, মৃত্যু, নতুবা অভাবিত সৌভাগ্য। কাশিমবাজারের এই সুখটুকু ছাড়া 'ইণ্ডিজ' তাঁকে আর কিছুই দিল না। না, লিভারের অসুখ, না অভাবিত সৌভাগ্য। কিন্তু কে জানত, কাশিমবাজারের সাংসারিক সুখটুকুও বিধাতা পুরুষ কেড়ে নেবেন অমন নির্মম ভাবে।

সেবার সতেরোশ আটান্ন, শরতের বাতাসে লেগেছে শীতের ছোঁয়া, অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখ। মেরির কোলে হেস্টিংসের একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। নবদম্পতি আদর করে এ মেয়ের নাম দিলেন এলিজাবেথ। জন্মলগ্ন থেকেই এলিজাবেথ ছিল অসুস্থ। তেইশ দিনের মাথায় মারা গেল মেয়েটি।—সেদিনের তারিখ আটাশে অক্টোবর। এ সময় থেকে ওয়ারেণ হেস্টিংসের জীবনে দুঃখ দিনের আবার আরম্ভ। এ সময় তাঁকে মাঝে মাঝেই যেতে হত বাইরে। যেতে হত মুর্শিদাবাদ, যেতে হত কলকাতা বা আরো দূরে। মেরির স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। পরের বছর সতেরোশ উনষাট খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক দারুণ অঘটন ঘটে গেল। হেস্টিংস কাশিমবাজারে ঠিক এই সময় ছিলেন না। গিয়েছিলেন রাজমহল, পরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি এসে দেখলেন মেরি চিরনিদ্রায় শায়িত। মাত্র দু বছর তিন মাসের দাম্পত্য জীবন, হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিভে গেল।···ওয়ারেণ হেস্টিংস অনেক কষ্টে মাথা ঠিক রাখলেন। শিশু জর্জ প্রায় তার মতনই মাতৃহীন হল। কয়েক মাসের ভেতরেই তাকে মানুষ করবার জন্য হেস্টিংস বিলেত পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে ওয়ারেণ হেস্টিংসের কর্ম জীবনেও অনেক পরিবর্তন হল। অনেক। কয়েক মাস পরে সতেরোশ যাটে ক্লাইব সাহেব প্রভূত ঐশ্বর্য ও অভাবিত সৌভাগ্য নিয়ে ফিরে গেলেন দেশে। কিছু পরেই হেনরী ভ্যানসিটার্ট ক্লাইব সাহেবের জায়গায় হয়ে এলেন গভর্নর। ওরারেণ হেস্টিংসের কার্য-দক্ষতায় তিনি খুশি ছিলেন, তাই চট্‌পট্‌ তাঁর কাউন্‌সিলের একজন সদস্য করে নিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ সময় তাঁকে করতে হত। অনেক। তবে কিছু মাথা মোটা মেম্বারদের সঙ্গে কাউন্সিলের সভায় প্রায়ই লেগে যেত বচসা ও তর্কাতর্কি। এঁরা বাঙ্‌লা দেশের পরিবর্তিত রাজনীতি বুঝতেন না, বুঝতে চাইতেন না। মীরকাশেমের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে একদিন হেস্টিংস অপমানিত হলেন। স্ট্যানলেক ব্যাটসন নামে এক বর্বর সাহেব হেস্টিংসের গালে চড় কষিয়ে দিলেন। উঃ সে কী অপমান! ব্যাটসন চীৎকার করে বলতে লাগল, 'হেস্টিংস হল মীরকাশেমের ভাড়া করা মোক্তার'!—কী ব্যক্তি জীবনে কী কর্ম জীবনে হেস্টিংসের সে কী যন্ত্রণা!···

শেষ পর্যন্ত তিনি বিরক্ত হয়ে ওয়ারেণ হেস্টিংস দেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করলেন। চৌদ্দ বছর তিনি এ দেশে চাকরী করলেন, কিন্তু কী পেলেন! বত্রিশ বছরের ওয়ারেণ হেস্টিংস এবার সে হিসাবটাই করতে বসলেন! কোমপানির কাছ থেকে কম মাইনে পেলেও নিজেরা আলাদাভাবে ব্যবসা চালিয়ে কোমপানির কর্মচারিরা সেকালে রোজগার করতে পারতেন। হেস্টিংসেরও আলাদা ব্যবসা ছিল। তবে হেস্টিংসের থেকে অনেক নিচু স্তরের কর্মচারীরা ভেট-সত্তগাত ও নজরানা নিয়ে অল্প সময়ের ভেতর প্রভূত টাকা রোজগার করে দেশে ফিরতেন। হেস্টিংস হিসাব করে দেখলেন অন্যের তুলনায় তাঁর সঞ্চয় অতি সামান্য। নগদ সঞ্চয় প্রায় কিছুই নেই। ব্যবসায় যা খাটছে, তার পরিমাণ হল তিরিশহাজার পাউণ্ড।

ঐ ব্যবসার আয়ের ওপর ভরসা করে হেস্টিংস ত্যাগ করলেন এ দেশ। খুবই বিষন্ন মনে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ও দেশে পৌছে জাহাজ

থেকে নেমেই শুনলেন, তাঁর শিশুপুত্র জর্জ যাকে হ্যামশায়ারে রেখেছিলেন পড়াশোনার জন্য, সে মারা গেছে আট মাস আগে ডিপ্‌থিরিয়ায়। আর কিছুদিন পরেই জানলেন—এ দেশে ব্যবসায় তাঁর যে টাকা খাটছিল, তার ভেতর বিশ হাজার পাউণ্ড ডুবে গেছে। মাথার ওপর চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ ডেমক্লিসের খড়্গের মত ঝুলছে।

প্রায় পাঁচবছর হেস্টিংস সাহেব ইংলণ্ডে থাকলেন। বয়সটাও বাড়তে বাড়তে বত্রিশ থেকে পৌঁছে গেল সাঁইত্রিশে। দীর্ঘকাল 'ইণ্ডিজে' থাকবার ফলে স্বদেশের সমাজের পক্ষে হেস্টিংস হয়ে গিয়েছিলেন অনুপযুক্ত। তাই পদে পদে হলেন বিপর্যস্ত। ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তার ওপর কপর্দকহীন মানুষ, এ মানুষকে কেই বা পোঁছে! ওয়ারেণ হেস্টিংস হিসাব করে দেখলেন, তাঁর যৌবনের উনিশটা বছর একদম জলে গিয়েছে। তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হল না, সার্থক হল না কোনো ইচ্ছাই। মনে মনে একটি গোপন আশা তিনি লালন করেছিলেন—দেনার দায়ে যে পৈত্রিক ভদ্রাসন এবং জমিজিরেত বিকিয়ে গিয়েছিল, তা টাকা-পয়সা জমিয়ে একদিন উদ্ধার করবেন। বলাবাহুল্য, এ আশা যে দুরাশা তা তিনি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। এইভাবে পাঁচসাত ভেবে নৈরাশ্যের গভীরে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকলেন আমাদের ওয়ারেন হেস্টিংস। আর বয়সটাও একটু বেড়ে যেতে থাকল, বত্রিশ থেকে এই ইংলণ্ডে বসে বসেই পৌঁছে গেলেন সাঁইত্রিশে।

উপায়!—না, কোনো উপায় নেই। পথ?—কোনো পথই খুঁজে পেলেন না ওয়ারেণ হেস্টিংস। শেষ পর্যন্ত তাই একটি চাকরির জন্য ইসট্ ইণ্ডিয়া কোমপানির কাছেই আবার ধর্না দিতে আরম্ভ করলেন। কোম্পানির দপ্তরে পর পর দুখানা দরখাস্ত করলেন, কিন্তু তা দু-দুবারই গেল নাকোচ হয়ে। আবার চেষ্টা করলেন, তৃতীয়বার।—উমেদারী ও তদ্বিরের কোনো ত্রুটি রাখলেন না। সুতরাং এবার সফলতা এলো। পেয়েগেলেন মাদ্রাজের এন্‌-সাইন্‌মেন্ট।

সেই সপ্তাহেই 'ইণ্ডিজ' রওনা দিচ্ছিল 'ডিউক অব গ্রাফটন' নামে একটি জাহাজ। বন্দরে তখনো সে দাঁড়িয়ে। জাহাজ ছাড়ার এই খবর পেয়ে তড়ি ঘড়ি সাহেব তৈরী হয়ে গেলেন। পকেট ফাঁকা, সুতরাং ধারকর্জ করেই বিদেশযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কিনতে হল। তারপর সোজা এসে উঠলেন জাহাজে। যথাসময়ে 'ডিউক অব গ্রাফটনে,র চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুল, ধক্ ধক্ করে উঠল এঞ্জিন এবং ধীরে ধীরে পোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে নীলজলের গভীর দরিয়ায় সে পাড়ি জমাল।—ওয়ারেণ হেস্টিংসও আবার দেশ ছাড়া হলেন।

দেখতে মোটেই 'আহা মরি' নন, মাঝারি ধরণের উচ্চতা। রোগা রোগা পাৎলা চেহারা। কপালটা বেজায় উঁচু। সাহেবদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'উইথ এ পিকিউলারলি মাসিভ ফোরহেড।' তার ওপর মাথা জোড়া টাক। অল্প বয়স থেকেই টাক ধরেছে। এ দিকে মাঝে মাঝেই ভুগছেন ডিস্‌পেপসিয়ায়। এই রকম চেহারার এক ব্যক্তি, বয়স সাঁইত্রিশ, বিপত্নীক, কপর্দকহীন—। হায়রে, এমন মানুষের মনেও প্রেমের উদয় হয়!

অথচ তাই শেষ পর্যন্ত হল। এবং অন্য কেউ নন, ইনি হলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। নিজের ভেতর নিজের এই পরিবর্তিত আচরণ দেখে কম অবাক হলেন না সাহবে স্বয়ং। কাশিমবাজারে থাকতে সাহেব বাজে-পোড়া অনেক গাছ দেখেছিলেন। সে সব বজ্রাহত গাছকে দেখেছিলেন শুকিয়ে যেতে। একবার ছাড়া এ জাতীয় কোনোগাছেই কোনো নবীন পাতার শ্যামল সম্ভার দেখেন নি। ওয়ারেণ হেস্টিংস এ পর্যন্ত নিজেকে ঐ বাজে-পোড়া গাছের দলেই ফেলে রেখেছিলেন। নবীন পত্রপুষ্পে এ গাছ যে আবার মঞ্জরিত হতে পারে, তা তিনি কখনো ভাবেন নি। কখনো না। তাই আজ এই জীর্ণচিত্তে প্রেমের আবির্ভাব দেখে অবাক হলেন।

দুপাশে কল্লোলিত ও ফেনিল ঢেউ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে

চলেছিল জাহাজ। দূরের নীল জলে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল সূর্যকিরণ। উপকূলের কাছ দিয়ে যখন জাহাজ চলছিল, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে বসছিল জাহাজে। ক্লাসিক্সের একদা তুখোড় ছাত্র ওয়ারেণ হেস্টিংসের খুব ভালোই লাগছিল এসব দেখতে। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে যখন শ্রীমতী ইম্‌হফের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল, তখন কী শরীরে কী মনে আশ্চর্য শিহরণ অনুভব করছিলেন। অবশ হয়ে আসছিল দেহ। কেমন যেন বিবশও হয়ে যাচ্ছিলেন। আর থেকে থেকে শেক্সপীয়ারের 'রোমিও-জুলিয়েটে'র বিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তি যাচ্ছিল মনে পড়ে।—তরুণ তরুণীর ভালোবাসা সত্যিসত্যি হৃদয়ে নয়, এ ভালোবাসা থির থির্ করে কাঁপে তাদের চোখে, 'ইয়ংমেন্‌স লাভ দেন লাইজ নট্ ট্রুলি ইন্ দেয়ার হার্টস্, বাট্ ইন্ দেয়ার আইজ।'

এই জাহাজেই সারা টমসন নামে আর একটি নব বিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হল ওয়ারেণ হেস্টিংসের। সঙ্গে ছিল তার ছোট বোন। সারার নিবিড় নীল চোখে ঝিলিক দিচ্ছিল প্রেমের আগুন। সে চলে ছিল কলকাতায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। বেচারি এই সুন্দরী মেয়েটি জানে না, ওয়ারেণ হেস্টিংস নিজের মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, কলকাতায় গিয়ে কী বিপদেই না পড়বে! সুন্দরী মেয়েদের গিলে খাবার জন্য অনেক হাঙ্গর কুমিরই আছে হাঁ করে।

কলকাতা সেদিন সত্যিসত্যিই হাঙ্গর কুমীরের রাজত্ব। সুন্দরীদের পেলে টপাটপ করে তারা গিলে ফেলে। তা সে অবিবাহিতা ও বিবাহিতা যাই হোক না কেন! সারা যে সেইরকম বিপদে গিয়ে পড়বে, এ বিষয়ে জাহাজে বসেই ওয়ারেণ হেস্টিংস প্রায় দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা, তার চোখে তখনও আলো ধরছিল। তার চোখে তখনো ছিল প্রেমের আবেশ। সুতরাং এ মেয়ের সর্বনাশ অনিবার্য।

কিন্তু ওয়ারেণ হেস্টিংস্, তুমি কী করছ?—পরস্ত্রী শ্রীমতী মেরিয়ান-কে তুমি এমন করে কাছে টানছ কেন?—নায়ক ওয়ারেণ হেস্টিংস এ

জিজ্ঞাসা নিজের মনে নিজেকে বার বার করলেন। বার বার। এবং বার বারই তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর ভেতরে একটি ক্ষুধার্ত হাঙ্গর ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। না না, সে হাঙ্গর নয়, হেস্টিংস নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিলেন। সে প্রেমিক, সে প্রেমের জন্য ভিখারী, ভালবাসার জন্য ভিখারী। হৃদয়ের সব সম্পদ উজাড় করে দিয়ে সে মেরিয়ানকে জয় করে নেবে। তাই সে বার বার উচ্চারণ করল, 'মেরিয়ান, আমার মেরিয়ান।' আর এরপরে ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে অথচ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে চলল, 'মেরিয়ান, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

এদিকে জাহাজ ভেসে চলল।...ভেসে চলল নীল দরিয়ার বুকে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে। দিনে দিনে ইমহফ পরিবারের সঙ্গে হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠতা এত নিবিড় হল যে সে ও শ্রীমতী ইম্‌হফ ভাবতেই পারেন না যে ওয়ারেণ হেস্টিংস তাঁদের কেউ নন। মাঝে মাঝে শ্রীমতী ইমহফের চোখেও খুশি উপচে পড়ছিল ওয়ারেণ হেস্টিংসের সান্নিধ্যে। এবং ওয়ারেণ হেস্টিংস তা বুঝতে পেরে বার বার আপ্লুত হলেন।

শেষ পর্যন্ত জাহাজ এসে ঠেকল মাদ্রাজে। তিনজন একই সঙ্গে নামলেন। সারা টমসন হাত নেড়ে এদের বিদায় জানালেন। সারার ঢলঢলে চোখে চিক চিক করে উঠেছিল জল। তবু সে অনেকক্ষণ ধরে রুমাল নেড়ে নেড়ে ডেকের রেলিং ধরে বিদায় জানাল। সারার জন্য হেস্টিংসের মনটাও গিয়েছিল রীতিমত খারাপ হয়ে, কেননা কলকাতার হাঙ্গর-কুমীরেরা এই মেয়েটিকে যে গোটাই গিলে ফেলবে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ।

মাদ্রাজের দিনগুলি হেস্টিংসের জীবনে সত্যিসত্যিই বহন করে নিয়ে এলো যৌবনের রোমান্স। ভারি সুন্দর আর ভারি মিষ্টি। উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি মনোরম কুঠি। কুঠির একহাতায় থাকবার ব্যবস্থা হল শ্রী ও শ্রীমতী ইমহফের। স্বামী আর ছোট চার্লসকে নিয়ে থাকেন শ্রীমতী।

ইমহফ সাহেব এখানে এসে উঠে পড়ে লেগে গেলেন কী করে ভাগ্য ফেরানো যায় তার ধান্ধায়। কেল্লায় গিয়ে হাজিরা দেন নিয়মিত, তারপর সেখানকার ডিউটি সেরে আবার বেরিয়ে পড়েন ছবি আঁকার লোক খুঁজতে। মাদ্রাজ সহরটি আকারে খুবই ছোট, তার ওপর খুবই দরিদ্র। আর সাহেব পাড়ায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা শৌখীনতার ব্যাপারে তেমন করে টাকা পয়সা ওড়াতে ইচ্ছুক নন। সুতরাং—

সুতরাং ঘরে ফিরে বেচারি ইমহফ হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। এই মুহূর্তে শ্রীমতী ইমহফ এই ভাগ্যান্বেষী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসেন। তবে মাঝে মাঝে এ বাবদে একবারেই যে রোজগার হয় না, তা নয়। যেদিন রোজগার হয়, সেদিন ইমহফ খুবই খুশি। সোহাগে আদরে শ্রীমতীকে অস্থির করে তোলেন। আর খুব বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন।

ওদিকে ওয়ারেণ হেস্টিংসও নানান কাজে ডুবে থাকেন। নানান কাজে। তবু মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট অবকাশ পাওয়া যায়। সেই অবকাশে শ্রীমতীর সংসারে এসে উঁকি দেন। বেশির ভাগ সময়েই শ্রীমতী থাকেন একা। ওয়ারেণ হেস্টিংসকে অতিথি হিসাবে পেয়ে শ্রীমতীর মন ভরে যায় আকস্মিক খুশিতে। আর সেই খুশির ছোঁয়ায় গাল ওঠে লাল হয়ে।—এই খুশি-খুশি ভাবটা ওয়ারেণ হেস্টিংসের চোখে এড়িয়ে যায় না। তাঁর প্রিয় মেরিয়ানকে এই সময় ভারি আদর করতে ইচ্ছে করে।

এইভাবে ধীরে ধীরে কখন তাঁরা যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলেন, তা নিজেরাই টের পেলেন না। প্রেমের ডোরে দুজনে বাঁধা পড়ে গেলেন। এবং তারপর তাঁরা দুজনে দুজনের মিলিত জীবন কেমন হতে পারে, বসলেন তার ছবি আঁকতে।

এইভাবে একান্ত গোপনে ও নিভৃতে শ্রীমতীর চিত্তে যখন প্রেমের কুঁড়ি বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে, তখন শ্রীমতীর গোপন মনের খবর না রেখে সৌভাগ্যের সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন সাহেব

ইমহফ্। স্বয়ং ওয়ারেণ হেস্টিংসও এ ব্যাপারে সাহেবকে সাহায্য করছিলেন! ফলে, সাহেবের রোজগার পাতি খারাপ কিছু হচ্ছিল না। বরং ভালোর দিকেই যাচ্ছিল। আর রোজগার যত বাড়ে, সাহেবও তত মেতে ওঠেন।—শেষকালে সাহেব জানলেন যে কলকাতা যেতে পারলে রোজগার আরো ভালো হবে। তাই কলকাতা যাবার জন্য হয়ে উঠলেন বদ্ধপরিকর! সতেরোশ সত্তর খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সাহেব কলকাতা যাবার সঙ্কল্প করে ফেললেন পাকাপাকি। সঙ্গে সঙ্গে কোমপানির সামরিক বিভাগে একটি দরখাস্তও করে দিলেন। লিখলেন, 'যে সামান্য মাইনে পাই তাতে নিজের ও পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং আমাকে কলকাতা যাবাব অনুমতি দেওয়া হোক।'

কোমপানি অনুমতি দিল, কিন্তু তা শর্ত সাপেক্ষে। সে শর্ত হল, আগে চাকরি ছাড়ো তারপর পাড়ি দাও বাঙলা মুলুকে। কোমপানির কথায় রাজি হয়ে গেলেন সাহেব। কাজে ইস্তফা দিয়ে ভাগ্যান্বেষণে এলেন তিনি কলকাতায়। ওয়ারেণ হেস্টিংস ও শ্রীমতী ইম্‌হফ ঠিক এই মুহূর্তটিই যেন খুঁজছিলেন!—অজানা ও অচেনা পরিবেশ, তারওপর অনিশ্চিত আয়, এর ওপর ভরসা করে স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে ভরসা পেলেন না সাহেব। পরিবর্তে ওয়ারেণ হেস্টিংসের এক চিঠি সঙ্গে করে চলে এলেন কলকাতায়। আর স্ত্রী রয়ে গেলেন ওয়ারেণ হেস্টিংসের কাছেই।

ওয়ারেণ হেস্টিংস আর শ্রীমতী ইমহফের প্রেম এবার ভরে উঠল কানায় কানায়। মিলনের জন্য দুজনের চিত্তই ছিল ব্যাকুল। ছিলেন দুজনেই উন্মুখ! এখন সে মিলন হল অবাধ, হল অবারিত, অনেক মধুর সন্ধ্যা, অনেক জ্যোৎস্না ঝরা রাত দুজনের মিলনে হয়ে উঠল উতরোল। এত ভালবাসা এত তৃষ্ণা ছিল তার হৃদয়ে!—ওয়ারেণ হেস্টিংস অবাক হয়ে নিজের চিত্তকে বিশ্লেষণ করলেন। আর একথা যতই তিনি ভাবেন, ততই বিস্ময় যেন আরো বেড়ে যায়। আর ওদিকে পঁচিশ বছরের যৌবন নিয়ে ভাবতে বসেন নায়িকা মেরিয়ান। যদিও ইনি দুটি সন্তানের জননী, যদিও সাহেব ইমহফের অনেক আদর-সোহাগের

উষ্ণতায় অনেক বিবশ মুহূর্ত কেটেছে তাঁর, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়ারেণ হেস্টিংসের ভালোবাসার পরশ না পেলে তাঁর এই ভরা যৌবন যেন ধন্য হত না। শ্রীমতী যেন ঘুমিয়েছিলেন, বিস্রস্ত কেশপাশ, অকস্মাৎ ভালোবাসার চুম্বন দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন নবীন নায়ক ওয়ারেণ হেস্টিংস এবং তারপর তাঁর প্রিয় মেরিয়ানকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন রোমান্সের রাজ্যে!—এইভাবে দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। বেশ কয়েকটি ঋতু এলো গেলো। আর এঁদের ভালোবাসা নিবিড় থেকে হয়ে উঠল নিবিড়তর।

এদিকে কলকাতায় এসে সাহেব ইমহফ ছবি আঁকার ব্যবসায় পসার কিছু খারাপ করলেন না। কয়েকমাসের ভেতর রোজগার পাতি করে ভালোই জমিয়ে ফেললেন টাকা পয়সা। অবশ্য এ ব্যাপারে ওয়ারেণ হেস্টিংসের পরিচিতি অনেকখানি কাজ করেছিল। ইমহফ যখন কলকাতায় আসেন, তখন ওয়ারেণ হেস্টিংস একটি চিঠি দিয়েছিলেন হ্যানকক নামে এক সাহেবকে। ইমহফের থাকবার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে হ্যানকক্‌কে হেস্টিংস লিখেছিলেন, 'একই জাহাজে এঁর সঙ্গে মাদ্রাজে এসেছি—'এ শিপমেট অফ্ মাইন, অ্যান অফিসার অফ সাম র‍্যাংক ইন্ জারমান সার্ভিস'—মাদ্রাজে এসে ছবি আঁকায় বেশ ভালোই নাম করেছিলেন। এখন ইনি ভাগ্যান্বেষণে চলেছেন কলকাতায়—'টু ট্রাই হিজ ফরচুন এ্যাজ এ মিনিয়েচার পেইন্‌টার ইন্ বেঙ্গল। আপনারা একটু দেখবেন।'

যাইহোক, এঁদের দেখাশোনাতেই হোক বা সাহেবের অঙ্কন-দক্ষতাতেই হোক—ব্যারণ ইমহফ্ ভালোই টাকা পয়সা করলেন এবং সতেরোশ একাত্তর সালের ভাদ্রমাস নাগাদ লিখে পাঠালেন ওয়ারেণ হেস্টিংসকে যে শ্রীমতী ইমহফ্‌কে যেন সত্বর কলকাতার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সত্বর।

এদিকে ওয়ারেণ ও মাদাম ইমহফ্ দুজনেই যখন দুজনের জন্য পাগল, একরতি বিচ্ছেদও যখন দুজনের সহ্য হয় না, ঠিক সেই সময়েই

এই চিঠি এসে পৌঁছুল মাদ্রাজে। পাহাড়ের ওপর যে কুঠিতে সর্বদাই বিরাজ করত বসন্ত, সেখানে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। নেমে এলো অন্ধকার।—তা যতই বিষাদ ও অন্ধকার নামুক না কেন ওয়ারেণ হেস্টিংস কর্তব্য পালনে পশ্চাৎপদ হলেন না। যদিও দুজনের চোখের জলে পথ অনেক পিচ্ছিল হল, বেদনায় ব্যথিত হল চিত্ত, তবু মাদাম ইমহফকে হেস্টিংস পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়।

তখন অক্টোবর মাস। সতেরোশ একাত্তর খ্রীষ্টাব্দ। কলকাতায় শরৎকাল। শিউলির গন্ধে এখানকার বাতাস রীতিমত ভারি। দীঘিতে দীঘিতে ফুটছে পদ্মফুল। সেই সময় শিশির সিক্ত পদ্মের লাবণ্য নিয়ে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে এসে নামলেন ব্যারণ ইমহফের স্ত্রী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আনা মারিয়া। আনা মারিয়াকে অনেকদিন পরে কাছে পেয়ে ইমহফ সাহেবও রীতিমত আপ্লুত। খুশিতে ডগমগ। প্রথম কয়েকদিন ঐ খুশির জোয়ারে ভালোই কাটল। কিন্তু আহ্লাদে যখন একটু ভাটা পড়ল, তখন সাহেব আবিষ্কার করলেন যে তাঁর স্ত্রীর সে রকম উষ্ণতা যেন আর নেই। বরং কেমন যেন সে উদাস, কেমন যেন বিষণ্ণ।

ওদিকে ওয়ারেণ হেস্টিংসের বিরহের দিনগুলি যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। কিছুতেই না। কাজে মন বসে না। মন বসে না কুঠিতেও। যে দিকে তাকান, সেদিকেই দেখেন স্মৃতি। এ স্মৃতি সর্বত্র আছে ছড়িয়ে, সর্বত্র। কেবল মারিয়ানই নেই।—ওয়ারেণ হেস্টিংস এক একবার ভাবেন যে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। এবং কলকাতায় গিয়ে তাঁর প্রিয়তমা মেরিয়ানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন।

এরকম অনেক এলোমেলো চিন্তাই করতে বসেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। কিন্তু কোনো চিন্তাই ঠিক সঙ্গত মনে হয় না। এদিকে দেখতে দেখতে শীত এসে গেল মাদ্রাজে। উঁচুপাহাড়ের ওপর বাড়ি। বাতাস এসে ধাক্কা মারে জানলায় খড়খড়িতে। বড়ো বড়ো গাছের ওপর দিয়ে

হাওয়া বয়ে যায় হু হু করে। শীতের গভীর রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে যায় ওয়ারেণ হেস্টিংসের। তারপর আর ঘুম আসে না। কেবল মেরিয়ানের স্মৃতি ভেসে ওঠে। মনে পড়ে অনেক ছোট ছোট স্মৃতি। মনে পড়ে অনেক কথা। ভেসে ওঠে দুটি নিবিড় নীলচোখ। আর —। বালিশের ওপর মুখ গুঁজে ওয়ারেণ হেস্টিংস বার বার অব্যক্ত বেদনায় অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'মেরিয়ান, আমার মেরিয়ান'—।

যাইহোক, এই ভাবেই সময় কাটে। কেটে যায় দিন। মাদ্রাজ কাউনসিলে গভর্নরের পরেই ছিল, ওয়ারেণ হেস্টিংসের স্থান। সুতরাং কাজের চাপ ছিল খুবই বেশি। বিরহের অজুহাতে উপায় ছিল না হাত গুটিয়ে বসে থাকবার। তাই বিরহের যন্ত্রণা বুকে চেপে কাজ করে যেতে হত তাঁকে। এবং ওয়ারেণ হেস্টিংস প্রায় মনস্থির করে নিয়েছিলেন যে যাকে কোনো দিনই পাবেন না, সেই অধরা নায়িকার জন্য আর মন খারাপ করবেন না।

সেদিন সকালে একটু বেশি শীতই ছিল। পাইন বনের মাথার ওপর দিয়ে শীতের ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছিল অবিরাম। একটি ভারি ওভার কোট পরে বাইরের লাউঞ্জে একা একা বসেই কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। পোষা বেরালের মত এক টুকরো সোনালি রোদ লুটিয়ে শুয়ে ছিল তাঁর পায়ের কাছে।—কফির কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গতকালের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলি দেখছিলেন উলটে পালটে। এবং এই চিঠিপত্র দেখতে দেখতেই হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। যা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, সেই অভাবিত শুভ সংবাদ একান্ত নীরবে এসেছে তাঁর কাছে। এই শুভ সংবাদ আর কিছু না, ওয়ারেণ হেস্টিংস কলকাতায় ফোর্ট উইলিঅমের গভর্ণর হিসাবে নিয়োগপত্র পেলেন।

ফোর্ট উইলিঅম! আবার সেই কলকাতা! না, একজন সামান্য রাইটার নয়, এবারে তিনি গভর্নর। এই অভাবিত সৌভাগ্যের কথা ভেবে ওয়ারেণ হেস্টিংস প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। মনে হল তিনি একবার

চীৎকার করে ওঠেন। সবাইকে ডেকে বলেন তাঁর এই আনন্দের কথা।

না, এই শুভ সমাচার ওয়ারেণ হেস্টিংসকে আলদা করে আর প্রচার করতে হল না। দেখা গেল, বাতাসে এ খবর হয়ে গেছে প্রচারিত। সকলে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কেউ কেউ রীতিমত খাতির করছেন। আর এর পর অজস্র চিঠি আসতে থাকল তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। কী স্বদেশ কী বিদেশ নামা জায়গা থেকে আসতে থাকল চিঠি।—না, ওয়ারেণ হেস্টিংস আর দেরী করলেন না, চট্‌পট এখানকার চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে রওনা দিলেন কলকাতায়। সতেরোশ বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্নরের পরোয়ানা হাতে নিয়ে হেস্টিংস সোজা গিয়ে নামলেন চাঁদপাল ঘাটে। দেখলেন, সেখানে এসেছেন অনেকেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। এসেছেন কাশিমবাজারের সেই কান্ত পান্তি—এসেছেন ব্যারণ ইমহফ এবং তাঁর পাশে শ্রীমতী ইমহফও আছেন দাঁড়িয়ে। প্রায় চারমাস পরে দেখা, আবার যে দেখা হবে এই প্রেমিক-প্রেমিকের কেউই তা ভাবতে পারেন নি। দুজনের অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু কেউই কোনো কথা বলতে পারলেন না; কেবল দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য বিনিময় করলেন!

নতুন গভর্নর জেনারেল কোথায় থাকবেন, তখনো ঠিক হয়নি। এক্‌টিনি গভর্নর জন কার্টিয়ার চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তখনো তাঁর সব কিছু গুছিয়েগাছিয়ে নেওয়া বাকি। ওয়ারেণ হেস্টিংস একলা মানুষ, তিনি সোজা গিয়ে উঠলেন নতুন কাউনসিল হাউসেই। আলাদা বাড়ির বদলে ওখানেই ক'খানা ঘর নিয়ে রয়ে গেলেন। জনকার্টিয়ার বিদায় নেবার পর, তেরোই এপ্রিল, কলকাতায় তখন ভরা বসন্ত, মহাসমারোহে ওয়ারেণ হেস্টিংস গিয়ে বসলেন বাঙ্‌লার মসনদে। এই নতুন লাটসাহেবের সম্মানে ফোর্ট উইলিঅম কেল্লা থেকে গুপুস্‌ গুপুস্‌ করে একুশ বার তোপধ্বনি হল। একুশবার।

হোন না কেন, রোগা রোগা পাৎলা চেহারার মানুষ, ওয়ারেণ

হেস্টিংস! হোন না কেন তিনি ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী। থাকুক না, তাঁর মাথা জোড়া টাক। আর বয়স যদিও চল্লিশ, তাই বলে তাঁর নায়ক হতে বাধা কোথায়? এমন যাঁর রাজার চাকরি, তার সব দোষই ঢেকে যায় ঐ চাকরির গুণে, সুতরাং ঐ নায়কের গলায় মালা দিতে কলকাতার সাদা তরুণীরা প্রায় সকলেই রাজি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে নায়কের কারোর দিকেই নজর নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গনার তনুশ্রীই তাঁর মনে সাড়া জাগায় না, কোনো সুন্দরী ললনাই তাঁকে বাঁধতে পারে না ভালোবাসার ডোরে। এই বিপত্নীক নায়কটি আশ্চর্য ভাবে উদাসীন, অথবা তিমি এমন কোন বিষণ্ণ চিন্তার শিকার যার খবর বাইরের লোকেরা কেউই রাখেন না। সে কথা যেন গোপনেই থেকে যায়। না, গোপন কথাটি গোপনে রইল না! একজন ডাক্তার গোপনে একথা লিখে পাঠালেন তাঁর স্ত্রীকে। স্বদেশে। ডাক্তারের নাম টিসো সল হ্যানকক। সেই হ্যানকক যাঁকে হেস্টিংস চিঠি লিখেছিলেন ইমহফের পরিচয় দিয়ে। ডাঃ হ্যানকক চিকিৎসার থেকে এখানে বেশি করে মেতে উঠেছিলেন ব্যবসাে! হ্যানকক পরিবার নানা ব্যাপারে হেস্টিংসের অনুরাগী ও আশ্রিত ছিলেন। ডাঃ হ্যানকক সতেরোশ পঁচাত্তরে এই কলকাতায় মাটিতেই দেহত্যাগ করেন। যাইহোক, হেস্টিংসের প্রেম ঐ ডাক্তারের চোখে প্রথম এখানে ধরা পড়ল। ইংল্যাণ্ডে মিসেস্ হ্যানকককে চিঠি লিখে তিনি জানালেন, 'মিঃ হেস্টিংসের সম্পর্কে তোমাকে যে কিছু জানাব, এ ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম। ইনি ভালো আছেন, দিন ছয় হল ঢুকেছেন গভমেন্‌টে। এর ভেতর দুবার আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি।'—এইরকন দুচারটে কথা বলতে বলতে আসল খবরটাই দিয়েছেন, লিখেছেন, 'একজন মহিলা, এঁর নান শ্রীমতী ইমহফ—রমণীকুলে ইনিই নতুন লাটসাহেবের 'প্রিন্‌সিপাল ফেভারিট।' একই জাহাজে একই সমুদ্রযাত্রায় ওয়ারেণ হেস্টিংসের সঙ্গে এসেছেন ভারতে। এঁর স্বামী ভদ্রলোক জার্মান সার্ভিসে ছিলেন এবং পরে ইনি ক্যাডেট হিসাবে এলেন মাদ্রাজে। অসির রোজগারে সংসার চালানো

অসম্ভব দেখে এবং 'মিনিয়েচার পেইন্‌টিং'-এ ঝোঁক থাকবার দরুণ, তরোয়াল ফেলে পরের জীবিকাটিই শেষ পর্যন্ত নিলেন বেছে। মাদ্রাজে যাঁরা চিত্রিত হতে উৎসুক ছিলেন, তাঁদের ছবি আঁকবার পর সতেরোশ সত্তর সালের শেষার্ধে উনি এলেন বাঙ্‌লা মুলুকে। শ্রীমতী মাদ্রাজেই রয়ে গেলেন, আমার মনে হয়, রয়ে গেলেন মিঃ হেস্টিংসের পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সেই কুঠিতেই। শ্রীমতীর বয়স ছাব্বিশের মতন। দেখতে ভারি সুন্দরী! ভারি মিষ্টি চেহারা, সেন্‌সিবল, লাইভলি। বাক্‌ চাতুর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি যে অসাধারণ তা প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন ইংরেজী ভংষা শিখতে। গত অক্টোবরে এসেছেন ইনি কলকাতায়। হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে এঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান না, ররং এঁরা একাত্ম ও ব্যক্তিগত হয়েই রয়েছেন। স্বামীটি একবারে খাঁটি জার্মান। শ্রীমতী ইমহফের উল্লেখ না করেও, মিঃ হেস্টিংসের সম্পর্কে যা জানি, বললে তাতেই কিন্তু তুমি খুব আনন্দ পাবে। এভরি থিং রিলেটিং টু মিঃ হেস্টিংস ইজ গ্রেট্‌লি ইনটারেস্টিং টু ইউ।'—সুতরাং—ওয়ারেণ হেস্টিংস গভর্নর হবার ছদিনের মাথায় হ্যানকক্‌ সাহেব যা তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন, কয়েক মাসের ভেতর কলকাতাবাসীরাও তা ধীরে ধীরে জেনে ফেললেন। আসলে একথা গোপন থাকুক এটা শ্রীমতী ইম্‌হফও চান নি। চান নি ওয়ারেণ হেস্টিংস নিজেও। বিপত্নীক লাটসাহেবের প্রেমের ব্যাপারে তদানীন্তন কলকাতাবাসীদেরও খুব কৌতূহল ছিল। এমন একটা মুখরোচক খবর তাঁরা কী মিইয়ে যেতে দিতে পারেন?—পারেন নি। তাঁরা আরো রসালো করে পাঁচজনের কাছে নিবেদন করলেন। মুখে মুখে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। সে ঘটনাগুলি এই রকম।—ব্যারণ ইমহফ যখন এ দেশে আসেন, তখন সামরিক বিভাগে একজন 'ক্যাডেট' হয়েই এসেছিলেন। কোমপানির ডিরেকটররা তাঁকে এ ভাবেই আসবার অনুমতি দিয়েছিলেন! সেকালে ব্যারণ ইমহফের মত আরো অনেকে এই ভাবে ওদেশ থেকে আসতেন এ

দেশে। পরে এই চাকরী ছেড়ে আরো পাঁচরকম রোজগারের সন্ধানে লেগে যেতেন, দু হাতে পয়সা রোজগার করতেন। বলাবাহুল্য, কোমপানি এই সব চাইত না। চাকরির আনুগত্য স্বীকার না করলে অনেক সময়েই তাদের দেশে ফেরৎ পাঠাবার জন্য হুকুম করতেন।

ব্যারণ ইমহফ যখন সামরিক বিভাগের চাকরি থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য ছটফট করছেন, সেই সময় তাঁকে এবং আরো দু জন সাহেবকে হঠাৎ 'কমিশন' অফার করা হল। বলাবাহুল্য, তিন জনই তা প্রত্যাখ্যান করলেন। মিলিটারী সার্ভিসে কমিশনড অফিসার হওয়া খুবই গৌরবের। এতে টাকা পয়সা দেওয়া হয় প্রভুত, এমন প্রলোভনের চাকরিও যখন তিন জন ক্যাডেট নিলেন না, তখন কোমপানির মালিকেরা ভীষণ চটে গেলেন। মাদ্রাজের গভর্নরকে তাঁরা অত্যন্ত কড়া ভাষায় লিখে পাঠালেন, 'ইফ দে অল রিফিউজ টু সার্ভ ইন্ দি মিলিটারী, দে শুড বি সেন্‌ট হোম বাই দি ফার্ষ্ট শিপ্'। অর্থাৎ তারা যদি এর পরেও সামরিক বিভাগে কাজ করতে অনিচ্ছুক হন,প্রথম জাহাজেই তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আর ব্যারণ ইমহফকে এঁরা আলাদা করে লিখলেন, 'ইফ ইমহফ ওয়াজ গন্ টু বেঙ্গল, দি অর্ডার ইজ টু বি ট্রানস্‌মিটেড্ টু ছাট গভমেন্‌ট ফর কম্‌প্লায়েনস্।'—ইমহফ যদি বাংলা মুলুকে গিয়ে থাকেতেন তা হলে এই আদেশ পালনের জন্য ওখানকার সরকারকে খবর পৌঁছে দাও। সতেরোশ বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের পঁচিশে মার্চ তারিখে কোমপানির ডিরেকটাররা এই ফতোয়া জারি করলেন। সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে এ খবর মাদ্রাজে পৌঁছুতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে গেল। আর মাদ্রাজ থেকে এ খবর যখন এখানে অর্থাৎ কলকাতায় এসে পৌঁছুল তখন অক্টোবর মাসের ছয় তারিখ। শ্রীমতী ইমহফের কলকাতায় আসা তখন এক বছর পূর্তি হয়ে গেল। বাঙ্‌লাদেশের আকাশে বাতাসে সেদিন শরতের ছোঁয়া। সাদা কাশফুলে বাতাস তখন উত্তরোল।

শিউলির গন্ধে আকাশ সন্ধ্যায় ম ম করে। মজা দীঘিতে ফোটে অজস্র পদ্মফুল।—আর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বসে ওয়ারেণ হেস্টিংস অবাক হয়ে যান তাঁর প্রিয়তমার মেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে।

যাই হোক শেষপর্যন্ত, ব্যারণ ইমহফের ভারত ত্যাগের পরোয়ানাটা ওয়ারেণের হাত দিয়েই পরিবেষিত হল। যে ওয়ারেণ হেস্টিংস আদর করে নিয়ে এলেন ইমহফ পরিবারকে, সযত্নে রাখলেন মাদ্রাজে নিজের কুঠিতে, পাঁচজনের কছে পরিচয় দিলেন নিজের একান্ত আত্মীয় বলে, সেই হেস্টিংসই শেষ পর্যন্ত তাঁর নামে পরেয়ানা লিখলেন, 'হি মাসট্ প্রিপেয়ার টু লিভ ফর ইংল্যাণ্ড।' বলাবাহুল্য, ব্যাপারটি খুবই নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। যাইহোক, ইমহফ সাহেবকে দেশে ফেরৎ পাঠান মানে শ্রীমতীকেও ছেড়ে দেওয়া। ওয়ারেণ হেস্টিংসের পক্ষে ব্যাপারটি যে কতখানি কঠিন ও ক্লেশকর তা অবশ্যই বিস্তারিত করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।—সব জেনেশুনেই বিষ পান করতে হল তাঁকে। নিজের হাতেই তিনি লিখলেন তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা।—তাঁর রাতের ঘুম চলে গেল। চলে গেল মনের শান্তি। প্রিয়তমা মেরিয়ানকে বাদ দিয়ে তিনি যে বাঁচতে পারবেন না তা তিনি আজ ভীষণ বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করলেন।

ওদিকে ইমহফ সাহেবের কুঠিতেও নেমে এলো থম্‌থমে অন্ধকার। ইমহফ সাহেব মাদ্রাজে কিছুটা এবং সহর কলকাতায় এসে বেশ ভালোই রোজগার পাতি করেছিলেন। অবশ্য আরো কিছুদিন থাকতে পারলে আরো মোটা টাকা রোজগার করতে পারতেন।—তাই হঠাৎ কোমপানির ঐ চিঠি ও নির্দেশ পেয়ে বেশ একটু বিরক্ত হলেন। না, এটা বিরক্তির বেশি আর কিছু না। ভারত ত্যাগের জন্য সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে গেলেন।

কিন্তু গোল বাধালেন স্ত্রী। শ্রীমতী চটে মটে বললেন, 'তুমি ক্যালকাটা ছেড়ে যেতে পারো, কিন্তু আমি যাবো না।'

'সে কী!'—সাহেব ইমহফ ত রীতিমত অবাক।

শ্রীমতী বললেন, 'কোমপানি তোমাকে পরোয়ানা পাঠিয়েছে এখান থেকে চলে যাবার জন্য, আমাকে দেয়নি। সুতরাং'—

'সুতরাং তুমি থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় থাকবে?'

'এই ক্যালকাটায়!'

'কে তোমাকে দেখবে?'

'তুমি।'

'আমি?' ইমহফ একটু অবাক হলেন। স্ত্রীর প্রস্তাবটা যে কতখানি অবাস্তব তা বোঝাবার জন্য হা হা করে হেসে উঠলেন, তারপর হাসি মুখেই বললেন, 'আরে, আমিই তো থাকছি না, আমি তাহলে কী করে তোমাকে দেখবো?

শ্রীমতী কিছুক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি অনারেবল গভর্নর হিজ এক্সেলেন্সি ওয়ারেণ হেস্টিংসকে বলব, তিনি নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি এই ক্যালকাটাতেই থাকব।'

এইভাবে ব্যাপারটি ধীরে ধীরে জটিল হয়ে উঠল। ব্যারণ কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে এই জঙ্গল-ভরা ক্যালকাটাতে কী আকর্ষণ আছে যে তার টানে তাঁর স্ত্রী এখানে থেকে যাবেন! সেকালে সব সাদা মানুষই এদেশে আসত দু হাতে টাকা রোজগারের জন্য। বেশ ভালো টাকা পয়সা রোজগার হয়ে গেলেই তাঁরা ফিরে যেতেন স্বদেশে, নিজের সমাজে। সেখানে তাঁরা দিন কাটাতেন আরামে বিলাসে। অর্থ কৌলীন্যে সামাজিক সম্মান অনেক বেড়ে যেত, এবং বাড়ির গৃহিণীরা তাই নিয়ে বেশ জাঁক করতেন।

এখন এই গৃহিণীই যদি বেঁকে বসেন স্বদেশে ফিরে যেতে, তাহলে কী আর করা যায়? সব ব্যাপারটিই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল, এলোমেলো হয়ে গেল—ব্যারণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

আর পরে ব্যাপারটি যখন সত্যিসত্যিই কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করলেন, তখন আরো অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হলেন। সম্পদ সঞ্চয়ে তিনি যখন ব্যাপৃত, বেচারি জানতেন না সেই সময় তাঁর বৌয়ের মন চুরি হয়ে গেছে। ব্যারণ ইমহফ যখন জানতে পারলেন যে এই চোর আর কেউ নন স্বয়ং ওয়ারেণ হেস্টিংস, তখন আবার একবার অবাক হলেন। তবে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন না।

ব্যারণ ইমহফ ছিলেন অনেক বাস্তববাদী লোক। প্রথম প্রথম একটু মন খারাপ করেই ঘুরলেন। পরে মনকে বোঝালেন। হিসাব করে দেখলেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাঁরা এসেছিলেন অর্থের ধান্ধায়। স্বামী সোনার হরিণের দিকে এত জোর দৌড়েছেন যে যৌবনবতী রূপসী স্ত্রীর দিকেও তাকাবার অবকাশ পান নি। আর ওদিকে স্বয়ং কুবের ধরা দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীর রূপের আকর্ষণে। বিলাসিনী যুবতী কী তা উপেক্ষা করতে পারেন?—নায়িকা এবার ঐশ্বর্যের অধিপতির গলাতেই পরিয়ে দিলেন তাঁর জয়মাল্য। 'সত্যিকথা বলতে কী,' ব্যারণ ইমহফ নিজের মনকে মনে মনে প্রবোধ দিলেন, 'জিত হয়ে গেল শ্রীমতীর। কারণ সে আরো বড়ো ঘাটে নৌকো বাঁধল।'

শ্রীমতীকে আর বিরক্ত না করে নিজেই শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করে ফেললেন ইমহফ। ভেতরে ভেতরে হেস্টিংসের সঙ্গে একটা রফাও হয়ে গেল। ইমহফ সাহেব সাফ জানিয়ে দিলেন, 'না ভার্যার না সন্তানদের কারো আর্থিক দায়দায়িত্ব তিনি নেবেন না।' নিলেন না। হেস্টিংসের এক বন্ধু ছিলেন রিচার্ড জনসন। হেস্টিংসের পক্ষ নিয়ে অত্যন্ত গোপনে তিনি কথা চালাচালি করলেন সাহেব ইমহফের সঙ্গে। এবং ভেতরে ভেতরে একটা বোঝাপড়াও হয়ে গেল। আর সেই বোঝাপড়ার সূত্রে পরবর্তী যা ঘটনা ঘটল, তা এইরকম।—

যেহেতু অভিভাবকত্ব বদল হয়ে গেল, সেহেতু পুত্র চার্লস বাবার সঙ্গে কিন্তু দেশে ফিরল না। তাকে আগে আলাদা জাহাজে পাঠানো হল দেশে। সতেরোশ বাহাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর 'গ্রীনউইচ'

জাহাজে সে পাড়ি দিল, দেশে পৌঁছুল পরের বছর এক্কুশে জুন। পুরো ছ মাস লেগে গেল। সেখানে পৌঁছুবার পর শ্রীমতীর দুই সন্তানকেই পাঠানো হল সেই 'চেসউইক' পরিবারে, আর তারপরে ওয়ারেণ হেস্টিংসের সেই বিখ্যাত স্কুল 'ওয়েস্টেমিনিসটারে'।

এদিকে পুত্রকে রওনা করে দেবার মাস দুই পরে ফেব্রুয়ারী মাসের একুশ তারিখে পিতা ইমহফ জাহাজে গিয়ে উঠলেন। জাহাজটির নাম, 'রকিংহ্যাম'। সঙ্গে দুজন চাকর। কলকাতায় তখন শীতের শেষ! বসন্তের দখিনা বাতাস কখনো কখনো বা অনুভব করা যায়। অনেক গাছেরই পাতা ঝরে গেছে। তলা বিছিয়ে পড়ে আছে ঝরাপাতা। সাহেবও সেই ঝরাপাতাদের দলে চলে গেলেন। মুখে সবাইকে বলে গেলেন, 'আমার স্ত্রী রইল, কোমপানির ডিরেকটারদের বুঝিয়ে শীগগিরই আমি ফিরে আসছি'—

ডাঃ হ্যানকক্ এই ইমহফ সাহেবের কথায় তাঁর স্ত্রীকে লিখলেন, 'মিঃ ইমহফ ইংলণ্ডে রওনা দিচ্ছেন। তাঁকে পরিচিত করে তোমাকে একটা চিঠি দেব। ওঁর স্ত্রী রয়ে গেলেন এখানে।' হ্যানকক্ এই পর্যন্ত লিখে একটু থামলেন, কৈফিয়ৎ দিয়ে লিখলেন, 'এ্যাজ—।' ঐ এ্যাজ লেখবার পর টানলেন একটি দীর্ঘ ড্যাস। প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা, বেশ মোটা করেই লম্বা লাইন টেনে ছেড়ে দিলেন! না দিলেন পূর্ণ বিরাম-চিহ্ন, না স্বল্প বিরামের, এর পর লিখলেন, 'হি ইনটেন্‌ডস রিটারনিং ইন দি সার্ভিস।' অর্থাৎ পুনরায় সে ফিরে আসতে চায় চাকরিতে।

এই পুনরায় চাকরিতে ফিরে আসবার ব্যাপারটি যে কতখানি ভাঁওতা, তা হ্যানকক্ ডাক্তারের অজানা ছিল না। এই ভাঁওতাকে বোঝাবার জন্যই সম্ভবতঃ অত ভণিতা করলেন।

এদিকে ইমহফ সাহেব কী করলেন দেখা যাক। সাত মাস সুদীর্ঘ জলযাত্রার পর জাহাজ 'রকিংহ্যাম' যখন গন্তব্য বন্দরে পৌঁছুল, তখন সেপ্‌টেম্বরের মাঝামাঝি। পাইন আর ঝাউয়ের বনে তখন পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। সাহেব যে ঝরাপাতাদের দলে চলে যান নি, তা

প্রমাণ করবার জন্ত তড়িঘড়ি রওনা দিলেন জার্মানি। সেখানে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ঠুকে দিলেন। দু বছরের ভেতরই পেয়ে গেলেন 'ডিভোর্স' এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটি ভালো দেখে মেয়ে খুঁজে বিয়ে করে ফেললেন!

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল এদিকে।

কলকাতার বুকে বাগান-ঘেরা ছোট একটি কুঠি। ঝি-চাকরানী রয়েছে সেবার জন্য। বাইরে রয়েছে দারোয়ান, পাহারাওয়ালার দল। রয়েছে আজ্ঞাবহরা, মুখের কথা খসাতে যা দেরী।—মাঝে মাঝে গভর্নর জেনারেল হিজ এক্সেলেনসি ওয়ারেণ হেস্টিংস স্বয়ং আসেন শ্রীমতীর তদারকি করতে—তবু একঘেয়ে নিঃসঙ্গতা কাটে না। মেরিয়ান কেবল দিন গুনতে থাকেন কবে ইমহফ সাহেবের বিবাহ বিচ্ছেদের খবরটা এসে পৌঁছুবে।—কবে?

ইতিমধ্যে মেরিয়ানের ছোঁয়া লেগে ওয়ারেণ হেস্টিংসের কপাল বেশ খুলে গেল। ও দেশে পারলামেনটে পাশ হয়ে গেল 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট'। এই এ্যাক্টের কল্যাণে কেবল বাঙলার নয়, ইংরেজ-অধিকৃত গোটা ভারতেরই গভর্নর জেরারেল হয়ে গেলেন ওয়ারেণ হেস্টিংস। তাঁর মাইনে নির্ধারিত হল বছরে আড়াই লাখ টাকা। তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য চারজন সদস্যের এক সভাও তৈরী হল, তাঁদের প্রত্যেকের বেতন ঠিক হল বার্ষিক এক লাখ টাকা করে। এই সভার সদস্য হিসাবে মনোনীত হলেন বারওয়েল সাহেব, লেঃ জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন ও ফিলিপ ফ্রানসিস। বারওয়েল সাহেব তখন এদেশেই ছিলেন, ওদেশ থেকে বাকি ক'জন সত্তেরোশ চুয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দের উনিশে অক্টোবর চাঁদপাল ঘাটে এসে নামলেন। এঁদের সম্মানে ফোর্ট উইলিঅম থেকে সত্তেরোবার তোপ পড়ল। সত্তেরোবার।

যাইহোক, ওয়ারেণ হেস্টিংসের প্রভাব প্রতিপত্তি যত বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সাহেব পাড়ায় চাপা কৌতূহল দেখা দেয়, লাট-গৃহিনী কবে ঘরে আসবেন, কবে? নন্দকুমারের যখন ফাঁসী হল, তখন সহর

কলকাতার কালো লোকেরা অনেকেই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে। সর্তক হবার জন্য ও সাবধানে থাকবার জন্য সুদূর মাদ্রাজ থেকে প্রাক্তন সহকর্মী ম্যাকফারসন একটি চিঠি লিখে হেস্টিংসকে জানালেন, 'ডু নট এমপ্লয় এনি ব্ল্যাক কুক্'—কালো চামড়ার লোককে বাঁধুনি রেখো না। 'লেট ইয়োর ফেয়ার ফিমেল ফ্রেণ্ড ওভার সি এভরিথিং ইউ ইট।' অর্থাৎ যা-ই খাওনা কেন, তোমার সুন্দরী বান্ধবীকে নজর রাখতে দিও।

ফিলিপ ফ্রানসিস্ আগাগোড়াই ছিলেন হেস্টিংসের শত্রু। ভুলেও তিনি কখনো ওয়ারেণ হেস্টিংসের সম্পর্কে একটিও ভালো কথা বলেন নি। বিচারপতি ইম্পের স্ত্রীর সঙ্গে হেস্টিংসের ভাবী-বধূর যে ঝগড়া ছিল এবং বৎসরাধিক যে কথা বন্ধ ছিল এ সব তাঁরই আবিষ্কার। যদিও তিনি মেরিয়ানের বয়স বেশ বাড়িয়েই লিখেছিলেন, কিন্তু রূপগুণের বর্ণনায় কিছু কারচুপি করতে পারেন নি। বরং খুশি হয়েই লিখেছিলেন, 'আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন অন্ গুড্ টার্মস্ উইথ দি লেডি···সি ইজ এ্যান্ এগ্রিয়েবল উওম্যান, অ্যাণ্ড হ্যাজ বিন্ ভেরি প্রেটি।' অর্থাৎ মেরিয়ান মেয়েটি ভারি মিষ্টি স্বভাবের, মনোরমা নারী।

সতেরোশ চুয়াত্তর সালের শেষদিকে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছিলেন ব্যারণ, আর 'ডিভোর্স' পেয়েও গিয়েছিলেন পরের বছরই। কিন্তু এ খবর কলকাতায় পৌঁছুল দেরীতে অর্থাৎ আরো একবছর পরে। সাতাত্তর সালের জুলাই মাসের প্রথমে এলো এ খবর। সঙ্গে সঙ্গে মেরিয়ান তাঁর 'ইমহফ' উপাধিটি ত্যাগ করে গ্রহণ করলেন কুমারী নাম, —মিস্ আন্না মারিয়া এ্যাপ্লোলোনিয়া চৌপাস্টিন।—এবার সারা কলকাতা তৈরী হতে থাকল একটি উৎসবের জন্য। এ উৎসব—ভারত সম্রাটের বিবাহোৎসব। বাইশ বছরের নায়িকার সঙ্গে সাঁইত্রিশ বছরের নায়কের যে দেখা হয়েছিল, আট বছর পরে তার মিলন হতে চলেছে। এখন নায়িকার বয়স তিরিশ, নায়ক পঁয়তাল্লিশ। শ্রীমতী ইম্পের সঙ্গে মারিয়ার না কী একদা গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল—'দি ডেমস্ কর এ টাইম অয়ার বুজম্ ফ্রেইণ্ড'—শ্রীমতী ইম্পে তাই বোধহয় এ বিবাহের 'ম্যাচ'

নিয়ে আপত্তি তুলেছেন, কিন্তু তাঁর এ কথায় বর-বধূ কেউই কান দিলেন না। 'প্রতীক্ষার মুহূর্তটি দ্রুত চলল পূর্ণতার পথে।

আটুই আগস্ট, শুক্রবার। সতেরোশ সাতাত্তর খ্রীষ্টাব্দ। সেন্ট জন্‌স ক্যাথিড্রালে' মহাসমারোহে ভারত ঈশ্বর ওয়ারেণ হেস্টিংসের সঙ্গে আন্না মারিয়ার বিবাহ হয়ে গেল। যাজক হিসাবে উপস্থিত থাকলেন রেভারেণ্ড উইলিঅম জনসন। গৃহিনী হিসাবে নববধূ যে যথার্থ যোগ্য ফিলিপ্‌ ফ্রানসিস্‌ তা স্বীকার করে তাঁর স্ত্রীকে লিখে পাঠালেন, 'দি লেডি হারসেল্‌ফ ইজ রিয়েলি অ্যান একমপ্লিশড উওম্যান। সী বিহেভ্‌স উইথ পারফেক্‌ট প্রোপাইটি ইন্‌ হার নিউ স্টেশন অ্যাণ্ড ডিজারভ্‌স এভরি মার্ক অব রেসপেক্‌ট।'

এবার আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল। রূপ কথা হলে এখানেই গল্পের শেষ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু এটা রূপকথা নয়, ওয়ারেণ হেস্টিংস নন রূপকথার রাজপুত্তুর, তাই আরো একটু লিখতে হয়। পুরোনো কলকাতার নায়িকাদের ইতিহাসে 'মেরিয়ান' একটি বিশিষ্ট নাম, এবং সত্যি বলতে কী এ পূর্ণতা কারো কপালেই জোটেনি। নায়িকা সারা টমসন ভালোবাসতে চেয়েছিল, চেয়েছিল বারওয়েলকে নিয়ে ঘর বাঁধতে ; কিন্তু পরিবর্তে সে হয়েছিল এক লম্পটের রক্ষিতা। রোজ এ্যালমার শুধু স্বপ্নই দেখেছিল, শুধু স্বপ্ন, সে স্বপ্ন সার্থক হয় নি। ঝরে গেল অকালেই। এমিলিয়া র‍্যাংহাম ছিলেন মক্ষিরাণী, আহত করেছিলেন অনেক হৃদয়কে, কিন্তু নিজের অন্তর কাউকে দেননি। এশথার লিচ্‌ তাঁর হৃদয়ের সকল সম্বল উজার করে দিয়েছিলেন মঞ্চ ও অভিনয়ের জন্য, কোনো মানব সন্তানের জন্য হয়নি তা নিবেদিত। আর বিষাদিনী দেরম্যাভিয়ের কথা না তোলাই ভালো, তাঁর সবই ছিল, কিন্তু কলঙ্ক ছাড়া তাঁর কপালে আর কিছুই জুটল না। এমন কী মৃত্যুর পরে এক কণা সহানুভূতিও না।

এই যখন নায়িকাদের হাল, তখন স্বীকার করতেই হয়, এই

নায়িকাদের সঙ্গে 'মেরিয়ানের' তুলনাই হয় না। ইনি অনুপমা, ইনি অতুলনীয়া। ওয়ারেণ হেস্টিংসের ভালোবাসা তাঁকে করেছিল মহীয়সী। দিয়েছিল সাম্রাজ্ঞীর মর্যাদা। আন্না মারিয়া ভালোবাসার উত্তাপেই হয়ে গিয়েছিলেন 'মেরিয়ান।'—এ নাম কোন ক্রীশ্চান নাম নয়, ওয়ারেণ হেস্টিংস দিয়েছিলেন এই ভালোবাসার নাম।

সাম্রাজ্ঞী মেরিয়ানের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। তাঁর অপরূপ তনুশ্রী সকলকেই করেছে মোহিত, করেছে অভিভূত। এমিলিয়া র‍্যাংহাম ও মাদাম্ গ্র্যাণ্ডের রূপের সঙ্গে কেউ কেউ তাঁর রূপের তুলনা করেছেন। তাঁর অপরূপ চুলের ঢাল, শিশুর মত সরল মুখশ্রী, সেই সঙ্গে খেয়ালীপনার মিশ্রণ, আবিষ্কার করেছেন কে সাহেবের স্ত্রী। কুমারী গোল্ডবোরণ এঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে গদগদ হয়ে লিখেছেন, 'হার ফিগার ইজ এ্যালিগ্যান্ট্, হার ম্যানার্স লাইভ্লি, অ্যাণ্ড এন্গেজিং অ্যাণ্ড হার হোলো এ্যাপিয়ারেন্স এ মডেল অব টেস্‌ট্ অ্যাণ্ড ম্যাগনিফিসিয়েন্স্।'

কেবল স্বদেশবাসিনীদের চোখেই নয়, আমাদের দেশীয় লোকদের চোখেও মেরিয়ান ছিলেন অনন্যা।—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কালীপ্রসাদ চল্লিশ হাজার টাকার মুক্তোর মালা একদা উপঢৌকন দিয়ে গেলেন এই সাম্রাজ্ঞীর কর-পল্লবে। অবশ্য তার পিছনে একটু অভিসন্ধি ছিল, তা থাক, কিন্তু সে মালা যে সুন্দরীর গলায় সুন্দর ভাবে মানিয়েছিল, বাঙ্লা প্রবাদ আজও তার সাক্ষ্য দেয়, 'কিবা শোভে মুক্তোহার শ্বেতাঙ্গীর গলে।'

নায়িকাদের ভেতর, তাই স্বীকার করতেই হয়, মেরিয়ানই শ্রেষ্ঠা। মুক্তোর হার ঠিক তাঁর গলাতেই মানায়। হেস্টিংসের জীবনের অনেক মুহূর্তকেই তিনি মুক্তোর মতন দিয়েছেন মহার্ঘ করে। অনেক সুখের মুহূর্ত দিয়েছেন উপহার। এঁদের অনেক মধুর সন্ধ্যা কেটেছে বেল-ভডিয়ারে, কেটেছে সুখচরে, বা রাজমহল-মুঙ্গেরের পথে নৌকায়।··· ভারতবর্ষের অনেক মধুর সকাল সোনালি রোদের স্নিগ্ধতায় এই সুখী

দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছে। অনেক পাখির কাকলিতে এদের মন ভরেছে।···হৃদয় ভরেছে।···ভরেছে দেহের আকাঙ্ক্ষা।

ওয়ারেণ হেস্টিংস জীবনে পেয়েছেন অনেক, হারিয়েছেন তার থেকেও বেশি। তবে একটি সম্পদ যা তিনি পেয়েছিলেন, তার তুলনা হয় না, আর সে সম্পদটি হল বধূ মেরিয়ান। জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ওয়ারেণকে পরম যত্নে স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছেন এই মেরিয়ান। একবার নয়, বার বার। যেখানে আঘাত, সেখানেই নায়ক পেয়েছেন মেরিয়ানের কল্যাণ স্পর্শ।

সেবার শীতকাল। খ্রীষ্টাব্দ সতেরোশ পঁচাশি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ভারত প্রবাস শেষ করে ওয়ারেণ হেস্টিংস প্রত্যাবর্ত্তন করলেন স্বদেশে। বয়স তাঁর সেদিন তিপ্পান্ন। রোগা পাৎলা চেহারার মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে অনেক ঝড় তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। তিনি এখন ক্লান্ত। বিশ্রাম এখন তাঁর বড়ো প্রয়োজন! ওয়ারেণ হেস্টিংসও নিজের মনে মনে বার বার উচ্চারণ করলেন, 'শান্তি চাই শান্তি চাই,—শান্তি,—

কিন্তু শান্তি চাইলেই কী পাওয়া যায়! ওয়ারেণ হেস্টিংস অন্তত পেলেন না।

ভারত থেকে আসবার সময় মোটা টাকা তিনি নিয়ে এসেছিলেন ডেলস্‌ফোর্ডের পৈত্রিক বাড়ি সে টাকায় তিনি কিনে নিলেন। জমি জিরেতও কিছু কিছু উদ্ধার করলেন। মনে হল, এবার বাকি জীবনটা সুখেই কাটবে।—না কাটল না, ঠিক তিন বছরের মাথাতেই লেগে গেল বুদ্ধুমার। তাঁর বিরুদ্ধে এলো নানান অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত আরম্ভ হল 'ইম্‌পীচ্‌মেন্‌ট'। সাত বছর ধরে ঝামেলা চলল। একশ পঁয়তাল্লিশ দিন টানা বিচারের পর শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস সাহেব যদিও ছাড়া পেলেন সসম্মানে, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়েই গেল। সত্তর হাজার পাউণ্ড গলে গেল এই ঝামেলায়, ধনে প্রাণে বিধ্বস্ত হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

এরপরেও তেইশ বছর বেঁচে ছিলেন হেস্টিংস।···নিজের মধ্যেই নিজে

ডুবে থাকতেন।…অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি ভেসে উঠত তাঁর চোখের সামনে।…আঠারোশ আঠারো খ্রীষ্টাব্দের বাইশে আগষ্ট শেষবেশ হিজ্ একসেলেনসি ওয়ারেণ হেস্টিংসের কর্মময় জীবনের অবসান হয়ে গেল। তাঁর একান্ত প্রিয় মেরিয়ানকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে চলে গেলেন পরপারে।

এবার প্রকৃত দায়িত্ব ঘাড়ে চাপল মেরিয়ানের।…মেরিয়ানেরও বয়স হয়েছে। তিনি আর ঠিক কিশোরী বা যুবতী নায়িকা নন। নীল চোখে তাঁর আর ঝিলিক দেয় না, সোনালি চুলের ঢালে আর ঢেউ খেলে না। জরা তাঁকে গ্রাস করেছে। শীতের হাওয়া কাঁপুনি জাগায় হাড়ে হাড়ে। ওয়ারেণের মৃত্যুর পর মেরিয়ান স্বামীর জীবনকে অমর করে রাখবার তাগিদ অনুভব করলেন। পারিবারিক সব কাগজ পত্র সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলেন কবি সাদের কাছে। সাদে নামকরা কবি, লেখেন ভালো, কিন্তু কাগজ পত্রের আয়তন দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। কাগজ ফেরৎ পাঠালেন।—মেরিয়ান এবার তাঁর স্বামীর জীবনী লেখবার জন্য পারিবারিক বন্ধু ইম্পেকে ধরলেন। ইম্পে রাজী। ছয় বছর ধরে কাগজ পত্র পড়ে টড়ে দেখলেন। তারপর এক লাইনও লেখবার আগে দুম করে মারা গেলেন! পারিবারিক কাগজপত্র আবার ফিরে এলো ডেলসফোর্ডের সেই বাড়ীতে। আঠারোশ পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এ কাগজগুলি এ বাড়িতেই পড়ে রইল।—মেরিয়ান অসহায় বোধ করতে থাকলেন।—মেরিয়ান শেষবেশ মরিয়া হয়ে গ্রেগ সাহেবকে ধরলেন, ছয় বছর অমানুষিক খাটুনি খেটে গ্রেগ লিখলেন হেস্টিংসের জীবনী। ভারত নায়কের স্মৃতিকথা।

এ জীবনীটি যে নিখুঁত ভাবে লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, এ জীবনীতে একটি জীবন নির্মম ভাবে ছাঁটা, আর সে জীবনটি হল ওয়ারেণের প্রথমা স্ত্রী মেরীর। শোনা যায়, এ সম্পর্কে সব কাগজই সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন নায়িকা মেরিয়ান। সব কাগজ দিয়েছিলেন নষ্ট করে। বলাবাহুল্য, এখানেও মেরিয়ান প্রকৃত নায়িকা। সুতরাং প্রতি-নায়িকা সম্পর্কে তিনি ভীষণ ঈর্ষাকাতরও।

পুরনো দিনের কলকাতায় সব কিছুই ছিল। ছিল বসন্ত। ছিল নায়ক নায়িকা। বসন্তে মধুবাতাস বইত। পাখির কাকলিতে মুখর হত সকাল-সন্ধ্যা। নায়ক-নায়িকার চোখে আবেগ আসত। আসত আবেগও। অনুরাগে অনেকেরই মন উঠত রাঙা হয়ে। সেদিন হৃদয়-দেওয়া-নেওয়ার খেলায় কেউ হেরেছেন, কেউ জিতেছেন, কারো কারো বা জীবন গিয়েছে ব্যর্থ হয়ে। কারো বা যৌবন।···কে এ সব মনে রাখে? ···কে মনে রাখে এদের?—ইতিহাস!—না, ইতিহাস এ সব হালকা কথা মনে রাখে না!—গল্প-উপন্যাস!—না, বানিয়ে বলবার মত এত তুচ্ছও এঁরা নন।—তাই এঁরা আমাদের কলকাতার ইতিহাসে না-বলা-বানীর মতই একান্ত গোপনে আজো রয়ে গেছেন। সার টমসন, রোজ এ্যালমার, এশথার লিচ, ম্যাদাম দেরমঁ্যাভিয়ে থেকে মেরিয়ান সকলেই আছেন, আছেন এই কলকাতাতেই, তবে চোখের সামনে নয় হৃদয়ের গভীরে। কখনো কখনো এঁদের প্রকাশ ঘটে একালের নায়িকাদের অনুরাগে। অভিমানে। কখনো ব্যাকুল বিরহে, কখনোবা প্রতীক্ষায়। একালের বসন্ত তাঁদের স্মৃতিতেই ব্যাকুল। আবার কখনো উতরোল।

তবু আমরা তাদের মনে রাখি কই?···কেননা, মনে রাখবার মত সময় কোথায়? কালীঘাটের পথে আজো ভক্তদের মিছিল চলেছে।··· ইতিহাসে পাতার পর পাতা হয়ে চলেছে লেখা।···কোথায় পুরনো কলকাতা, আর কোথায় আমরা?—সুতরাং—

সুতরাং পুরনো কলকাতার নায়িকাদের কথা এখানেই শেষ করা যেতে পারে। এঁদের স্মৃতি অজানা ফুলের গন্ধের মতই আমাদের মনকে মাঝে মাঝে ভরে তুলুক। ভারি করুক! বিষণ্ণ করুক।

॥ সমাপ্ত ॥

এই গ্রন্থ রচনায় যে সব বই থেকে বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

Dictionray Of Indian Biography—Buckland.

Early Aunals Of The English In Bengal—C. R. Wilson

Echoes From Old Calcutta—Busteed

পলাশির যুদ্ধ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আজব নগরী—শ্রীপান্থ

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—হরিহর শেঠ

Calcutta: Old and New—Cotton.

পত্র-পত্রিকা:

Bengal: Past of Present.